674 (a)

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ : কার্তিক ১৮৮১

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

সূচী

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

•

পরশুরাম-লিখিত
অন্যান্য গল্পের বই :

গড্ডলিকা ৩·০০
কজ্জলী ২·৫০
হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প ২·৫০
গল্পকল্প ২·৫০
ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প ৩·০০
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২·৫০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৩·০০

•

চমৎকুমারী

বক্রেশ্বর দাস সরকারী গুণ্ডা দমন বিভাগের একজন বড় কর্মচারী। শীতের মাঝামাঝি এক মাসের ছুটি নিয়ে নববিবাহিত পত্নী মনোলোভার সঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে বুড়ো চাকর বৈকুণ্ঠ আছে। এঁরা গণেশমুণ্ডায় লালকুঠি নামক একটি ছোট বাড়িতে উঠেছেন। জায়গাটি নির্জন, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর।

বক্রেশ্বরের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, মনোলোভার পঁচিশের নীচে। বক্রেশ্বর বোঝেন যে তিনি সুদর্শন নন, শরীরে প্রচুর শক্তি থাকলেও তাঁর যৌবন শেষ হয়েছে। কিন্তু মনোলোভার রূপের খুব খ্যাতি আছে, বয়সও কম। এই কারণে বক্রেশ্বরের কিঞ্চিৎ হীনতাভাব অর্থাৎ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে।

প্রভাত মুখুজ্যে মহাশয় একটি গল্পে একজন জবরদস্ত ডেপুটির কথা লিখেছেন। একদিন তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক দেখা করেন। ডেপুটিবাবু তা জানতে পেরে স্ত্রীকে যথোচিত ধমক দেন এবং আগন্তুক লোকটিকে আদালতী ভাষায় একটি কড়া নোটিস লিখে পাঠান। তার শেষ লাইনটি (ঠিক মনে নেই) এইরকম।—বারাদিগর এমত করিলে তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ করা হইবে। সেই ডেপুটির সঙ্গে বক্রেশ্বরের স্বভাবের কিছু মিল আছে। দরিদ্রের কন্যা অল্পশিক্ষিতা ভালমানুষ মনোলোভা তাঁর স্বামীকে চেনেন এবং সাবধানে চলেন।

জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। বিকেল বেলা মনোলোভা বললেন, চল চম্পীদিদির সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি ওই তিরসিংগা পাহাড়ের কাছে লছমনপুরায় আছেন, চিঠিতে লিখেছিলেন আমাদের এই বাসা থেকে বড় জোর সওয়া মাইল।

বক্রেশ্বর বললেন, আমার ফুরসত নেই। একটা স্কীম মাথায় এসেছে, গভরমেণ্ট যদি সেটা নেয় তবে দেশের সমস্ত বদমাশ শায়েস্তা হয়ে যাবে। এই ছুটির মধ্যেই স্কীমটা লিখে ফেলব। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নিও।

—বৈকুণ্ঠর ঢের কাজ। বাজার করবে, দুধের ব্যবস্থা করবে, রান্নার যোগাড় করবে। আর ও তো অথর্ব বুড়ো, ওকে সঙ্গে নেওয়া মিথ্যে। আমি একাই যেতে পারব, ওই তো তিরসিংগা পাহাড় সোজা দেখা যাচ্ছে।

—ফিরতে দেরি ক'রো না, সন্ধ্যের আগেই আসা চাই।

লছমনপুরায় পেঁছে মনোলোভা তাঁর চম্পীদিদির সঙ্গে অফুরন্ত গল্প করলেন। বেলা পড়ে এলে চম্পীদিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, যা যা শিগ্‌গির ফিরে যা, নয়তো অন্ধকার হয়ে যাবে, তোর বর ভেবে সারা হবে। আমাদের দুটো চাকরই বেরিয়েছে, নইলে একটাকে তোর সঙ্গে দিতুম। কাল সকালে আমরা তোর কাছে যাব।

মনোলোভা তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। মাঝপথে একটা সরু নদী পড়ে, তার খাত গভীর, কিন্তু এখন জল কম। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর আছে, তাতে পা ফেলে অনায়াসে পার হওয়া যায়। নদীর কাছাকাছি এসে মনোলোভা দেখতে পেলেন, বাঁ দিকে কিছু দূরে চার-পাঁচটা মোষ চরছে, তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিংওয়ালা জানোয়ার

কুটিল ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। মোষের রাখাল একটি ন-দশ বছরের ছেলে। সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি বলল বোঝা গেল না। মনোলোভা ভয় পেয়ে দৌড়ে নদীর ধারে এলেন এবং কোনও রকমে পার হলেন, কিন্তু ওপারে উঠেই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, পায়ের চেটোয় অত্যন্ত বেদনা।

চারিদিক জনশূন্য, সেই রাখাল ছেলেটাও অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আতঙ্কে মনোলোভার বুদ্ধিলোপ হল। হঠাৎ তাঁর কানে এল—

—একি, পড়ে গেলেন নাকি?

লম্বা লম্বা পা ফেলে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি একজন বুড়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ, পরনে ইজার, হাঁটু পর্যন্ত আচকান, তার উপর একটা নকশাদার শালের ফতুয়া, মাথায় লোমশ ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপি।

মনোলোভার দুই হাত ধরে টানতে টানতে আগন্তুক বললেন, হেঁইও, উঠে পড়ুন। পারছেন না? খুব লেগেছে? দেখি কোথায় লাগল।

হাত পা গুটিয়ে নিয়ে মনোলোভা বললেন, ও আর দেখবেন কি, পা মচকে গেছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনি দয়া করে যদি একটা পালকি টালকি যোগাড় করে দেন তো বড়ই উপকার হয়।

—খেপেছেন, এখানে পালকি তাঞ্জাম চতুর্দোলা কিছুই মিলবে না, স্ট্রেচারও নয়। আপনি কোথায় থাকেন? গণেশমুণ্ডায় লাল-কুঠিতে? আপনারাই বুঝি আজ সকালে পৌঁছেছেন? আমি আপনার পায়ে একটু মাসাজ করে দিচ্ছি, তাতে ব্যথা কমবে। তার পর আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরতে

পারবেন। যদি মচকে গিয়ে থাকে, চুনে-হলুদে লাগালেই চট করে সেরে যাবে।

বিব্রত হয়ে মনোলোভা বললেন, না না আপনাকে মাসাজ করতে হবে না। হেঁটে যাবার শক্তি আমার নেই। আপনি দয়া করে আমাদের বাসায় গিয়ে মিস্টার বি দাসকে খবর দিন তিনি নিয়ে যাবার যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

—পাগল হয়েছেন? এখান থেকে গিয়ে খবর দেব, তার পর দাস মশাই চেয়ারে বাঁশ বেঁধে লোকজন নিয়ে আসবেন, তার মানে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ আপনি অন্ধকারে এই শীতে একা পড়ে থাকবেন তা হতেই পারে না। বিপদের সময় সংকোচ করবেন না, আপনাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছি।

—কি যা তা বলছেন!

—কেন, আমি পারব না ভেবেছেন? আমি কে তা জানেন? গগনচাঁদ চক্কর, গ্রেট মরাঠা সার্কাসের স্ট্রং ম্যান। না না, আমি মরাঠী নই, বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী পদবীটা ছেঁটে চক্কর করেছি। সম্প্রতি টাকার অভাবে সার্কাস বন্ধ ছিল, তাই এখানে আসবার ফুরসত পেয়েছি। আজ সকালে আমাদের ম্যানেজার সাপুরজীর চিঠি পেয়েছি—সব ঠিক হয়ে গেছে, দু হপ্তার মধ্যে তোমরা পুনায় চলে এস। জানেন, আমার বুকের ওপর দিয়ে হাতি চলে যায়, দু হন্দর বারবেল আমি বনবন করে ঘোরাতে পারি। আপনার এই শিঙি মাছের মতন একরত্তি শরীর আমি বইতে পারব না?

—খবরদার, ও সব হবে না।

—কেন বলুন তো? আপনি কি ভেবেছেন আমি রাবণ আর আপনি সীতা, আপনাকে হরণ করতে এসেছি? আপনাকে আমি বয়ে নিয়ে গেলে আপনার কলঙ্ক হবে, লোকে ছিছি করবে?

—আমার স্বামী পছন্দ করবেন না।

—কি অদ্ভুত কথা! অমন রামচন্দ্রী স্বামী জোটালেন কোথা থেকে? বিপদের সময় নাচার হয়ে আপনাকে যদি বয়ে নিয়ে যাই তাতে আপত্তির কি আছে? আপনার কর্তা বুঝি মনে করবেন আমার ওপর আপনার অনুরাগ জন্মেছে, আমার স্পর্শে আপনি পুলকিত হয়েছেন, এই তো? একবার ভাল করে আমার মুখখানা দেখুন তো, আকর্ষণের কিছু আছে কি?

পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড টর্চ বার করে গগনচাঁদ নিজের শ্রীহীন মুখের ওপর আলো ফেললেন, তার পর বললেন, দেখুন, লোকে আমার মুখ দেখতে সার্কাসে আসে না, শুধু গায়ের জোরই দেখে। আমার এই চাঁদবদন দেখলে আপনার স্বামীর মনে কোনও সন্দেহই হবে না।

মনোলোভা বললেন, কেন তর্ক করে সময় নষ্ট করছেন। আপনার চেহারা সুশ্রী না হলেও লোকে দোষ ধরতে পারে।

—ও, বুঝেছি। আপনার চিত্তবিকার না হলেও আমার তো আপনার ওপর লোভ হতে পারে—এই না? নিশ্চয় আপনি নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করেন। একদম ভুল ধারণা, মিস চমৎকুমারী ঘার্পাদের কাছে আপনি দাঁড়াতেই পারেন না।

—তিনি আবার কে?

গগনচাঁদ চক্কর তাঁর ফতুয়ার বোতাম খুললেন, আচকানেরও খুললেন, তার নীচে যে জামা ছিল, তারও খুললেন। তার পর মুখে একটি বিহ্বল ভাব এনে নিজের উন্মুক্ত লোমশ বুকে তিনবার চাপড় মারলেন।

মনোলোভা প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রণয়িনী নাকি?

—শুধু প্রণয়িনী নয় মশাই, দস্তুরমত সহধর্মিণী। তিন মাস হল দুজনে বিবাহবন্ধনে জড়িত হয়ে দম্পতি হয়ে গেছি।

—তবে মিস চমৎকুমারী বললেন কেন? এখন তো তিনি শ্রীমতী চক্কর।

—আঃ, আপনি কিছুই বোঝেন না। মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে হল তাঁর স্টেজ নেম, আমেরিকান ফিল্ম অ্যাকট্রেসরা যেমন পঞ্চাশবার বিয়ে করেও নিজের কুমারী নামটাই বজায় রাখে, সেইরকম আর কি। চমৎকুমারী হচ্ছেন গ্রেট মরাঠা সার্কাসের লীডিং লেডি, বলবতী ললনা। যেমন রূপ, তেমনি বাহুবল, তেমনি গলার জোর। একটা প্রমাণ সাইজ গরু কিংবা গাধাকে টপ করে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে পারেন। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত কানে চেপে অন্য হাতে তম্বুরা নিয়ে ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে পারেন। মহারাষ্ট্রী মহিলা, কিন্তু অনেক কাল কলকাতায় ছিলেন, চমৎকার বাঙলা বলেন। আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দেব। চমৎকুমারীকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে আমার হৃদয় শক্ত খুঁটিতে বাঁধা আছে, তার আর নড়ন চড়ন নেই।

—আপনি আর দেরি করবেন না, দয়া করে মিস্টার দাসকে খবর দিন।

—কি কথাই বললেন! আমি চলে যাই, আপনি একলা পড়ে থাকুন, আর বাঘ কি হুড়ার কি লক্কড় এসে আপনাকে ভক্ষণ করুক। শুনতে পাচ্ছেন? ওই শেয়াল ডাকছে। আপনার হিতাহিত জ্ঞান এখন লোপ পেয়েছে, কোনও আপত্তিই আমি শুনবো না। চুপ, আর কথাটি নয়।

নিমেষের মধ্যে মনোলোভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গগনচাঁদ সবেগে চললেন। মনোলোভা ছটফট করতে লাগলেন। গগনচাঁদ

বললেন, খবরদার হাত পা ছুড়বেন না, তা হলে পড়ে যাবেন, কোমর ভাঙবে, পাঁজরা ভাঙবে। এত আপত্তি কিসের? আমাকে কি অচ্ছুত হরিজন ভেবেছেন না সেকেলে বঠ্‌ঠাকুর ঠাউরেছেন যে ছুঁলেই আপনার ধর্মনাশ হবে? মনে মনে ধ্যান করুন—আপনি একটা দুরন্ত খুকী, রাস্তায় খেলতে খেলতে আছাড় খেয়েছেন, আর আমি আপনার স্নেহময়ী দিদিমা, কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

আপত্তি নিষ্ফল জেনে মনোলোভা চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। গগনচাঁদ হাতের মুঠোয় টর্চ টিপে পথে আলো ফেলতে ফেলতে চললেন।

বক্রেশ্বর দাস দুজনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, একি ব্যাপার? গগনচাঁদ বললেন, শোবার ঘর কোথায়? আগে আপনার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিই, তার পর সব বলছি। এই বুঝি আপনার চাকর? ওহে বাপু, শিগ্‌গির মালসা করে আগুন নিয়ে এস, তোমার মায়ের পায়ে সেক দিতে হবে।

মনোলোভাকে শুইয়ে গগনচাঁদ বললেন, মিস্টার দাস, আপনার স্ত্রী পড়ে গিয়েছিলেন, ডান পায়ের চেটো মচকে গেছে। চলবার শক্তি নেই, অথচ কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না, কেবলই বলেন, লে আও পালকি, বোলাও দাস সাহেবকো। আমি জোর করে এঁকে তুলে নিয়ে এসেছি। অতি অবুঝ বদরাগী মহিলা, সমস্ত পথটা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে এসেছেন।

মনোলোভা অস্ফুট স্বরে বললেন, বাঃ, কই আবার দিলুম!

বক্রেশ্বর একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন গরম হয়ে বললেন, তুমি লোকটা কে হে? ভদ্রনারীর ওপর জুলুম কর এতদূর আস্পর্ধা?

—অবাক করলেন মশাই। কোথায় একটু চা খেতে বলবেন, অন্তত কিঞ্চিৎ থ্যাংকস দেবেন, তা নয়, শুধুই ধমক!

—হু আর ইউ? কেন তুমি ওঁর গায়ে হাত দিতে গেলে?

—আরে মশাই, ওঁকে যদি নিয়ে না আসতুম তা হলে যে এতক্ষণ বাঘের পেটে হজম হয়ে যেতেন, আপনাকে যে আবার একটা গিন্নীর যোগাড় দেখতে হত।

—চোপরও বদমাশ কোথাকার। জান, আমি হচ্ছি বক্রেশ্বর দাস আই. এ. এস, গুন্ডা কণ্ট্রোল অফিসার, এখনি তোমাকে পুলিসে হ্যান্ড-ওভার করতে পারি?

—তা করবেন বইকি। স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছেন সেদিকে হুঁশ নেই, শুধু আমার ওপর তম্বি। মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই, নইলে আমিও রেগে উঠব। এখন চললুম, নির্মল মুখুজ্যে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর তেড়ে এসে গগনচাঁদের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললেন, অভি নিকালো।

গগনচাঁদ বেগে চলতে লাগলেন, বক্রেশ্বর পিছু পিছু গেলেন। কিছুদূর গিয়ে গগনচাঁদ বললেন, লড়তে চান? আপনার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তার পর লড়বেন। যদি সবুর করতে না পারেন তো কাল সকালে আসতে পারি।

বক্রেশ্বর বললেন, কাল কেন, এখনই তোকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। জানিস, আমি একজন মিড্‌লওয়েট চ্যাম্পিয়ন? এই নে, দেখি কেমন সামলাতে পারিস।

গগনচাঁদ ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে ঘুষি থেকে আত্মরক্ষা করলেন এবং বক্রেশ্বরের পায়ের গুলিতে ছোট একটি লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে বক্রেশ্বর ধরাশায়ী হলেন।

গগনচাঁদ বললেন, কি হল দাস মশাই, উঠতে পারছেন না? পা মচকে গেছে? বেশ যা হক, কর্ত্তাগিন্নীর এক হাল। ভাববেন না, আপনাকে তুলে নিয়ে গিন্নীর পাশে শুইয়ে দিচ্ছি, তার পর ডাক্তার এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

বক্রেশ্বর বললেন, ড্যাম ইউ, গেট আউট ইহাঁ সে।

—ও, আমার কোলে উঠবেন না? আচ্ছা চললুম, আর কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর বেশ শক্তিমান পুরুষ, ভাবতেই পারেন নি যে ওই বদমাশ গুণ্ডাটা তাঁর প্রচণ্ড ঘুষি এড়িয়ে তাঁকেই কাবু করে দেবে। শুধু ডান পায়ের চেটো মচকায় নি, তাঁর কাঁধও একটু থেঁতলে গেছে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, বৈকুণ্ঠ, ও বৈকুণ্ঠ।

প্রায় পনরো মিনিট বক্রেশ্বর অসহায় হয়ে পড়ে রইলেন। তার পর নারীকণ্ঠ কানে এল—অগ্‌গ বাঈ! হে কায়? কায় ঝালা তুম্‌হালা? —ওমা, এ কি? কি হয়েছে আপনার?

ব্রক্রেশ্বর দেখলেন, কাছা দেওয়া লাল শাড়ি পরা মহিষমর্দিনী তুল্য একটি বিরাট মহিলা টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বক্রেশ্বর বললেন, উঃ বড্ড লেগেছে, ওঠবার শক্তি নেই। আপনি—আপনি কে?

—চিনবেন না। আমি হচ্ছি চমৎকুমারী ঘাপার্দে, গ্রেট মরাঠা সার্কসের বল্‌বতী লল্‌না।

—আপনি যদি দয়া করে ওই লালকুঠিতে গিয়ে আমার চাকর বৈকুণ্ঠকে পাঠিয়ে দেন—

—আপনার চাকর তো রোগা পটকা বুড়ো, আপনার এই দু-মনী

লাশ সে বইতে পারবে কেন? ভাববেন না, আমিই আপনাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

—সেকি, আপনি?

—কেন, তাতে দোষ কি, বিপদের সময় সবই করতে হয়। ভাবছেন আমি অবলা নারী, পারব না? জানেন, আমি একটা পুরুষ্টু গাধাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়ুতে পারি?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বক্রেশ্বর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চমৎকুমারী খপ করে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, ওকি, অমন কুঁকড়ে গেলেন কেন, লজ্জা কিসের? মনে করুন আমি আপনার মেসোমশাই, আপনি একটা পাজী ছোট ছেলে, আপনার চাইতেও পাজী আর একটা ছেলে লাথি মেরে আপনাকে ফেলে দিয়েছে, মেসোমশাই দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

চমৎকুমারী তাঁর বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে তিন মিনিটের মধ্যে লালকুঠিতে পেঁছিলেন এবং বিছানায় মনোলোভার পাশে ধপাস করে ফেলে বক্রেশ্বরকে শুইয়ে দিলেন। বক্রেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, উহুহু বড্ড ব্যথা। জান মনু, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম, ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, গ্রেট মরাঠা সার্কসের স্ট্রং লেডি মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে।

মনোলোভা অবাক হয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

নির্মল ডাক্তার তাঁর কম্পাউন্ডারকে নিয়ে এসে পড়লেন। স্বামী-স্ত্রীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়, দুজনেরই পায়ে একটু স্প্রেন হয়েছে। একটা লোশন দিচ্ছি, তাতেই সেরে যাবে। তিন-চার দিন চলাফেরা করবেন না, মাঝে মাঝে নুনের পুঁটলির সেক দেবেন। মিস্টার দাসের কাঁধে একটা ওষুধ লাগিয়ে ড্রেস করে দিচ্ছি।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার চলে গেলেন। চমৎকুমারী

বললেন, আপনাদের চাকর একা সামলাতে পারবে না, আমি আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তার পর যাব।

বক্রেশ্বর করজোড়ে বললেন, আপনি করুণাময়ী, যে উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, তা ভুলবে কেন, ওই গোদা হাতের জাপটানি যে প্রাণে সুড়সুড়ি দিয়েছে। যত দোষ বেচারা গগনচাঁদের।

বক্রেশ্বর বললেন, ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলুম, আপনার স্বামী মিস্টার চক্করও এখানে আছেন। কাল বিকেলে আপনারা দুজনে দয়া করে এখানে যদি চা খান তো কৃতার্থ হব। আমার এক শালী কাছেই থাকেন, তাঁকে কাল আনাব, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। আমার তো চলবার শক্তি নেই, নয়তো নিজে গিয়ে আপনাদের আসবার জন্যে বলতুম।

চমৎকুমারী বললেন, কাল যে আমরা তিন দিনের জন্যে রাঁচি যাচ্ছি। শনিবারে ফিরব। রবিবার বিকেলে আমাদের বাসায় একটা সামান্য টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি। চক্করের বন্ধু হোম মিনিস্টার শ্রীমহাবীর প্রসাদ, দুমকার ম্যাজিস্ট্রেট খাস্তগির সাহেব, গিরিডির মার্চেন্ট সর্দার গুরুমুখ সিং এঁরা সবাই আসবেন। আপনারা দুজনে দয়া করে এলে খুব খুশী হব। কোনও কষ্ট হবে না, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আসবেন তো?

বক্রেশ্বর বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, হেই মা কালী, রক্ষা কর।

কর্দম মেখলা

পুষ্কর সরোবরের তীরে বিশ্বামিত্র আর মেনকা কাছাকাছি বসে আছেন। মেনকা তাঁর কেশপাশ আলুলায়িত করে কাঁকুই দিয়ে আঁচড়াচ্ছেন, বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে আত্মচিন্তা করছেন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বিশ্বামিত্র কপাল কুঁচকে নাক ফুলিয়ে বললেন, মেনকা, তুমি সরে যাও, তোমার চুলের তেলচিটে গন্ধ আমি সইতে পারছি না।

ভ্রূভঙ্গী করে মেনকা বললেন, তা এখন পারবে কেন। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত আমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। চুলে কি মাখি জান? মলয়গিরিজাত নারিকেল তৈলে পঞ্চাশ রকম গন্ধদ্রব্য ভিজিয়ে ধন্বন্তরী আমার জন্যে এই কেশতৈল প্রস্তুত করেছেন। এর সৌরভে দেব দানব গন্ধর্ব মানব মুগ্ধ হয়, আর তোমার তা সহ্য হচ্ছে না! মুখ হাঁড়ি করে রয়েছ কেন, মনের কথা খুলেই বল না।

বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি মূর্খ অপ্সরা, দ্রব্যগুণ কিছুই জান না। উত্তম গন্ধতৈলও আর্দ্রবায়ুর সংস্পর্শে বিকৃত হয়। স্ত্রীজাতির নাকের সাড় নেই, কিন্তু অন্য লোকে দুর্গন্ধ পায়।

—এতদিন তুমি দুর্গন্ধ পাও নি কেন?

—আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, লুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পূতিগন্ধকে দিব্য সৌরভ মনে করতাম, তোমার কুটিল কালসর্প সম বেণী কুসুমদাম বলে ভ্রম হত, তোমার ক্লিন্ন অশুচি দেহের স্পর্শে আমার আপাদমস্তক হর্ষিত হত। সেই কদর্য মোহ এখন অপসৃত হয়েছে। মেনকা, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি চলে যাও।

মেনকা বললেন, ছ মাসেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? আমি যখন প্রথমে তোমার এই আশ্রমে এসেছিলাম তখন আমাকে দেখেই তুমি সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে লোলুপ হয়েছিলে। আমি কিন্তু নিষ্কামভাবে নির্বিকার চিত্তে অপ্সরার কর্তব্য পালন করেছি, তোমার কুৎসিত জটাশ্মশ্রু আর লোমশ বক্ষের স্পর্শ, তোমার দেহের উৎকট শার্দূলগন্ধ সবই ঘৃণা দমন করে সয়েছি। ওহে ভূতপূর্ব কান্যকুব্জরাজ মহাবল বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়ে তুমি সসৈন্যে মার খেয়েছিলে। তখন তুমি বিলাপ করেছিলে—ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। তার পর তুমি ব্রহ্মর্ষি হবার জন্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলে। কিন্তু ইন্দ্রের আদেশে যেমনি আমি তোমার কাছে এলাম তখনই তোমার মুণ্ড ঘুরে গেল, তপস্যা চুলোয় গেল, একটা অবলা অপ্সরার কাছেও আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এখন হয়তো বুঝেছ যে, ব্রহ্মতেজের বলও অপ্সরার বলের কাছে তুচ্ছ, অনেক রাজর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি আমাদের পদানত হয়েছেন। যা বলি শোন—ব্রহ্মর্ষি হবার সংকল্প ত্যাগ করে অপ্সরা হবার জন্যে তপস্যা কর।

বিশ্বামিত্র বললেন, কটুভাষিণী, তুমি দূর হও।

—তা হচ্ছি। আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান আছে তার ব্যবস্থা কি করবে?

—স্বর্গবেশ্যার সন্তানের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। যা করবার তুমি করবে।

—তুমি তো মহা বেদজ্ঞ আর পুরাণজ্ঞ। এ কথা কি জান না যে অপ্সরা কদাপি সন্তান পালন করে না? আমরা প্রসব করেই সরে পড়ি, এই হল সনাতন রীতি। অপত্যপালন জন্মদাতারই কর্তব্য, গর্ভধারিণী অপ্সরার নয়।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি আমার তপস্যা পণ্ড করেছ, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করেছ, চরিত্র কলুষিত করেছ। পাপিষ্ঠা, দূর হও এখান থেকে, তোমার গর্ভস্থ পাপও তোমার সঙ্গে দূর হয়ে যাক।

পুষ্কর সরোবরের ধার থেকে খানিকটা কাদা তুলে নিয়ে মেনকা দুই হাতে তাল পাকাতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলেন, ও আবার কি হচ্ছে?

কাদার পিণ্ড পাকিয়ে সাপের মতন লম্বা করে মেনকা বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, তোমার সন্তান আমি চার মাস গর্ভে বহন করেছি, আরও প্রায় পাঁচ মাস বইতে হবে। তোমার কৃতকর্মের ফল শুধু আমিই বয়ে বেড়াব আর তুমি লঘুদেহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে তা হতে পারে না। তোমাকেও ভার সইতে হবে। এই নাও।

মেনকা তাঁর হাতের লম্বা কাদার পিণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করলেন। বিশ্বামিত্রের কটিদেশে তা মেখলার ন্যায় জড়িয়ে গেল।

চমকে উঠে মুখ বিকৃত করে বিশ্বামিত্র বললেন, আঃ! সেই কর্দম মেখলা টেনে খুলে ফেলবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন পুষ্করের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুয়ে ফেলবার জন্যে দুই হাত দিয়ে ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সেই কালসর্প তুল্য মেখলার ক্ষয় হল না, নাগপাশের ন্যায় বেষ্টন করে রইল।

হতাশ হয়ে বিশ্বামত্র জল থেকে তীরে উঠে এলেন। মেনকাকে আর দেখতে পেলেন না।

বিশ্বামিত্র পুনর্বার তপস্যায় নিরত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারলেন না, কর্দম মেখলার নিরন্তর সংস্পর্শে তাঁর ধৈর্য নষ্ট হল, চিত্ত বিক্ষোভিত হল। তিনি আশ্রম

ত্যাগ করে আকুল হয়ে পর্যটন করতে লাগলেন, হিমাচল থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, নানা তীর্থসলিলে অবগাহন করলেন, কিন্তু মেখলা বিগলিত হল না। এই ভাবে সাড়ে পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মালিনী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। নদীর কাকচক্ষু তুল্য নির্মল জল দেখে তাঁর মনে একটু আশার উদয় হল। উত্তরীয় তীরে রেখে বিশ্বামিত্র জলে নামলেন এবং অনেকক্ষণ প্রক্ষালন করলেন, কিন্তু তাঁর মেখলা পূর্ববৎ অক্ষয় হয়ে রইল। অবশেষে তিনি বিষণ্ণ মনে জল থেকে তীরে উঠতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, পাঁকের মধ্যে তাঁর দুই পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল।

প্রাণভয়ে বিশ্বামিত্র চিৎকার করলেন। মালিনীর তটবর্তী বন-ভূমিতে তিনটি মেয়ে খেলা করছিল, একটির বয়স পাঁচ, আর দুটির সাত-আট। বিশ্বামিত্রের আর্তনাদ শুনে তারা ছুটে এল এবং নিজেরাও চিৎকার করে ডাকতে লাগল—ও পিসীমা দৌড়ে এস, কে একজন ডুবে যাচ্ছে।

পিসীমা অর্থাৎ গৌতমী লম্বা আঁকশি দিয়ে একটি প্রকাণ্ড অম্রাতক বৃক্ষ থেকে পাকা আমড়া পাড়ছিলেন। মেয়েদের ডাক শুনে ছুটে এলেন। নদীর ধারে এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, নড়বেন না, তা হলে আরও ডুবে যাবেন। এই আঁকশিটা বেশ শক্ত, পাঁকের তলা পর্যন্ত পুঁতে দিচ্ছি, এইটেতে ভর দিয়ে স্থির হয়ে থাকুন। এই অনু আর প্রিয়, তোরা দুজনে দৌড়ে যা, আমি যে চাঁচাড়ির চাটাইএ শুই সেইটে নিয়ে আয়।

অনু আর প্রিয় অল্পক্ষণের মধ্যে ধরাধরি করে একটা চাটাই নিয়ে এল। গৌতমী সেটা পাঁকের উপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এইবারে

আস্তে আস্তে পা তুলে চাটাইএর উপর দিন, তাড়াতাড়ি করবেন না। আঁকশিটা পাঁক থেকে টেনে নিচ্ছি। এই এগিয়ে দিলাম, দু হাত দিয়ে ধরুন।

আঁকশির এক দিক বিশ্বামিত্র ধরলেন, অন্য দিক গৌতমী ধরে টানতে লাগলেন, মেয়েরা তাঁর কোমর ধরে রইল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে তীরে উঠে এসে বললেন, ভদ্রে, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। কে আপনি দয়াময়ী? এই দেবকন্যার ন্যায় বালিকারা কারা?

গৌতমী বললেন, আমি মহর্ষি কণ্বের ভগিনী গৌতমী। এই অনু আর প্রিয়—অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, এরা এই আশ্রমবাসী পিপ্পল আর শাল্মল ঋষির কন্যা। আর এই ছোটটি শকু—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা শকুন্তলা। আমার ভ্রাতার আশ্রম এই মালিনী নদীর তীরেই। সৌম্য, আপনি কে?

—আমি হতভাগ্য বিশ্বামিত্র।

—বলেন কি, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! আপনার এমন দুর্দশা হল কেন?

অনু আর প্রিয় নাচতে নাচতে বলল, ওরে বিশ্বামিত্র মুনি এসেছে, শকুর বাবা এসেছে রে, এক্ষুনি শকুকে নিয়ে যাবে রে!

শকুন্তলা ভ্যাঁ করে কেঁদে গৌতমীকে জড়িয়ে ধরল।

অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে ধমক দিয়ে গৌতমী বললেন, চুপ কর দুষ্টু মেয়েরা, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছিস!

বিশ্বামিত্র বললেন, খুকী, তোমার বাবা কে তা জান?

শকুন্তলা বলল, আমার বাবা কণ্ব মুনি, আর মা এই পিসীমা।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, দূর বোকা,

সব্বাই জানে আর তুই কিচ্ছু জানিস না। তোর বাবা এই বিশ্বামিত্র মুনি, আর মা—

গৌতমী দুই মেয়ের পিঠে কিল মেরে বললেন, দূর হ এখান থেকে। এই রাজর্ষির পরিধেয় ভিজে গেছে, তোদের বাবার কাছ থেকে শুখনো কাপড় চেয়ে নিয়ে আয়। আর তোদের মাকে বল, অতিথি এসেছেন, আমাদের আশ্রমেই আহার করবেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, বস্ত্রের প্রয়োজন নেই, আমার অধোবাস আপনিই শুখিয়ে যাবে, আর আমার উত্তরীয় শুষ্কই আছে। আপনি আহারের আয়োজন করবেন না, আমার ক্ষুধা নেই। দেবী গৌতমী, এই বালিকাকে কোথায় পেলেন?

গৌতমী নিম্নকণ্ঠে জনান্তিকে বললেন, মেনকা প্রসব করেই মালিনী নদীর তটে একে ফেলে চলে যায়। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে দেখেন, এক ঝাঁক হংস সারস চক্রবাকাদি শকুন্ত পক্ষ বিস্তার করে চারদিকে ঘিরে সদ্যোজাত এই বালিকাকে রক্ষা করছে। দয়ার্দ্র হয়ে তিনি একে আশ্রমে নিয়ে আসেন। শকুন্ত কর্তৃক আরক্ষিতা, সেজন্য আমরা নাম দিয়েছি শকুন্তলা।

বিশ্বামিত্র বললেন, কন্যা, একবারটি আমার কোলে এস।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না, যাব না, তুমি আমার বাবা নও, কণ্ব মুনি আমার বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বামিত্র বললেন, ঠিক কথা। আমি তোমার পিতা নই, মেনকাও তোমার মাতা নয়, যারা তোমাকে ত্যাগ করেছিল তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন তাঁদেরই তুমি কন্যা। খুকী, তুমি কি খেলনা চাও বল, রুপোর রাজহাঁস, সোনার হরিণ, পান্না-নীলার ময়ূর—

অনসূয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভারী তো। আমাদের আসল হাঁস হরিণ ময়ূর আছে।

প্রিয়ংবদা বলল, আমাদের হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে, হরিণ লাফায়, ময়ূর নাচে। তোমার হাঁস হরিণ ময়ূর তা পারে?

বিশ্বামিত্র বললেন, না, শুধু ঝকমক করে। শকুন্তলা, তুমি আমার সঙ্গে চল। শত রাজকন্যা তোমার সখী হবে, সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে, স্বর্ণমণ্ডিত গজদন্তের পর্যঙ্কে তুমি শোবে, দেবদুর্লভ অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পায়স তুমি খাবে, মণিময় চত্বরে সখীদের সঙ্গে খেলা করবে। তোমাকে আমি সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী করে দেব।

গৌতমী বললেন, কি করে করবেন? আপনার কান্যকুব্জ রাজ্য তো পুত্রদের দান করে তপস্বী হয়েছেন।

—তুচ্ছ কান্যকুব্জ রাজ্য আমার পুত্ররাই ভোগ করুক, তা কেড়ে নিতে চাই না। বাহুবলে আর তপোবলে আমি সসাগরা ধরা জয় করে আমার কন্যাকে রাজরাজেশ্বরী করব। যত দিন কুমারী থাকে তত দিন আমিই এর প্রতিভূ হয়ে রাজ্যশাসন করব। তার পর অতুলনীয় রূপবান গুণবান বলবান বিদ্যাবান কোনও রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে একে সম্প্রদান করে পুনর্বার তপস্যায় নিরত হব।

গৌতমী বললেন, কি বলিস শকু, যাবি এই রাজর্ষির সঙ্গে?

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না না যাব না।

গৌতমী বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, জন্মের পূর্বেই যাকে বর্জন করেছিলেন তার প্রতি আবার আসক্তি কেন? আপনার সংযম কিছুমাত্র নেই। বশিষ্ঠের কামধেনুর লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, মেনকাকে দেখে আপনি উন্মত্ত হয়েছিলেন, এখন আবার তার কন্যাকে দেখে স্নেহে অভিভূত হয়েছেন। এই বালিকার

কল্যাণই যদি আপনার অভীষ্ট হয় তবে একে আর উদ্বিগ্ন করছেন কেন, অব্যাহতি দিন, এর মায়া ত্যাগ করে প্রস্থান করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, শকুন্তলা, তোমার এই পিসীমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তা হলে তুমি যাবে তো?

গৌতমী বললেন, কি যা তা বলছেন, আমি কেন আপনার সঙ্গে যাব?

—দেবী গৌতমী, আমি আপনার পাণিপ্রার্থী। আমাকে বিবাহ করে আপনি আমার কন্যার জননীর স্থান অধিকার করুন।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, পিসীমার বর এসেছে রে!

গৌতমী সরোষে বললেন, বিশ্বামিত্র, আপনি উন্মাদ হয়েছেন, আপনার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আর প্রলাপ বকবেন না, চলে যান এখান থেকে।

বিশ্বামিত্র কাতর স্বরে বললেন, শকুন্তলা, একবার আমার কোলে এস, তার পরেই আমি চলে যাব।

গৌতমী বললেন, যা না শকু, একবারটি ওঁর কোলে গিয়ে ব'স। ভয় কি, দেখছিস তো, তোকে কত ভালবাসেন।

শকুন্তলা ভয়ে ভয়ে বিশ্বামিত্রের কোলে বসল। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কন্যা, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ তোমাকে রক্ষা করুন, বসুগণ তোমাকে বসুমতীর ন্যায় বিত্তবতী করুন, ধী শ্রী কীর্তি ধৃতি ক্ষমা তোমাতে অধিষ্ঠান করুন—

হঠাৎ শকুন্তলা লাফিয়ে উঠে বলল, ওরে পিসীমা রে!

ব্যাকুল হয়ে গৌতমী বললেন, কি হল রে?

বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কর্দম মেখলা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিল করতে লাগল।

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, সাপ সাপ!

অনসূয়া বলল, ঢোঁড়া সাপ!

গৌতমী বললেন, জলডুণ্ডুভ। ওই দেখ, সড়সড় করে নদীতে নেমে যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বললেন সাপ নয়, মেনকার অভিশাপ, এতকাল পরে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কন্যা, তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি শাপমুক্ত পাপমুক্ত সন্তাপমুক্ত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, রাজেন্দ্রের রাজ্ঞী হও, রাজচক্রবর্তী সম্রাটের জননী হও। দেবী গৌতমী, আমি যাচ্ছি, আপনাদের মঙ্গল হক, আমার আগমনের স্মৃতি আপনাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাক।

১৮৮০

মাৎস্য ন্যায়

বাজারের সামনে দিবাকরের সঙ্গে তার এককালের সহপাঠী গণপতির দেখা হল। গণপতি বলল, কি খবর দিবু, আজকাল কি করছ? চেহারাটা খারাপ দেখছি কেন, কোনও অসুখ করেছে নাকি?

দিবাকর বলল, সিকি-পেটা খেলে চেহারা ভাল হতে পারে না। তিনটে ছেলেকে পড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকা পাচ্ছি আর চাকরির খোঁজে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি। নেহাত একটা বউ আছে, তিন বছরের একটা মেয়েও আছে, নয়তো সোজা পরলোকে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।

দিবাকরের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে গণপতি বলল, ভাল রোজগার চাও? ভাল ভাল জিনিস খেতে চাও? শৌখিন জামা কাপড় চাও?

—কে না চায়।

—দেদার ফুর্তি চাও? নারীমাংস চাও?

—নারী একটা আছে, কিন্তু মাংস নেই, শুধুই হাড়।

—কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হবে। সাহস আছে? বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা জান তো? রিস্ক নিতে পারবে?

—টাকার যদি আশা থাকে তবে সাহসের অভাব হবে না, রিস্কও নিতে পারব। হেঁয়ালি ছেড়ে খোলসা করেই বল না। আমাকে করতে হবে কি? জুয়ো খেলতে বল নাকি?

—না। জুয়ো হল অকর্মণ্য বড়লোকের খেলা, তোমার মতন নিঃস্বের কর্ম নয়। বেশ ভেবে চিন্তে বল—বিবেকের উপদ্রব আছে?

নরকের ভয়? মিছে কথা বলতে বাধে? এসব থাকলে কিছুই হবে না বাপু।

একটু ভেবে দিবাকর বলল, স্বর্গ নরক মানি না, তবে ধর্মভয় একটু আছে, চিরকালের সংস্কার কিনা। দরকার হলে অল্প স্বল্প মিছে কথাও বলি, প্র্যাকটিস করলে হয়তো অনর্গল বলতে পারব। দারিদ্র্য আর সইতে পারি না, এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। বাঁচতে চাই, তার জন্যে শয়তানের গোলাম হতেও রাজী আছি।

দিবাকরের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গণপতি বলল, ঠিক আছে। শুধু বাঁচলে চলবে না, জীবনটা পুরোপুরি ভোগ করতে হবে। আর একবার বল—বুকের পাটা আছে? বিপদকে অগ্রাহ্য করতে পারবে? ধর্মরূপী জুজুর ভয় ছাড়তে পারবে?

—সব পারব। কিন্তু তুমি তো শাস্ত্রচর্চা করে থাক, গীতাও আওড়াও, তোমার মুখে এসব কথা কেন?

—কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণ নাও, যুদ্ধে লেগে যাও। যদি জয়ী হও তো পৃথিবী ভোগ করবে, যদি মর তো স্বর্গলাভ করবে। আমিও তোমাকে সেই রকম উপদেশ দিচ্ছি—সব ছেড়ে দিয়ে আমার বশে চল। যদি জীবনযুদ্ধে জয়ী হও তবে সর্ব সুখ ভোগ করবে। আর যদি দৈবদুর্বিপাকে নিতান্তই হেরে গিয়ে জেলে যাও তবে বীরোচিত গতি লাভ করবে, তোমার দলের সবাই বাহবা দেবে। জেল থেকে ফিরে এসে পুনর্জন্ম পাবে, আবার উঠে পড়ে লাগবে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় এসো, পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেন। আমি তোমাকে দীক্ষা দেব, সকল অভাব দূর করব, সর্বপাপেভ্যো রক্ষা করব।

দিবাকর বলল, বেশ, আজ সন্ধ্যায় দেখা করব।

সন্ধ্যাবেলা দিবাকর পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেনে উপস্থিত হল। গণপতি অবিবাহিত, একটা চাকর নিয়ে একাই আছে। কি একটা খবরের কাগজে কাজ করে, জমি বাড়ি আর পুরনো মোটরের দালালিও করে। তার বসবার ঘরে একটা তক্তপোশের উপর শতরঞ্জি পাতা, দুটো তাকিয়া আর কতকগুলো পত্রপত্রিকা ছড়ানো। দেওয়ালে একটা র‍্যাকে কিছু বই আছে।

চাকরকে দু পেয়ালা চায়ের ফরমাশ দিয়ে গণপতি বলল, মাৎস্য সমাজের নাম শুনেছ? তোমাকে তার মেম্বার হতে হবে। ভয় নেই, প্রথম এক বৎসর চাঁদা দিতে হবে না।

দিবাকর বলল, মাৎস্য সমাজের কাজটা কি? ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে হয় নাকি? মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে—এই কি তোমার উপদেশ?

—সত্যিকারের মৎস্য নয়, মনুষ্যরূপী মৎস্যকে খাবলে খেতে হবে। মাৎস্য ন্যায় শুনেছ? মহাভারতে আছে—

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥

অর্থাৎ অরাজক জনপদে কারও নিজস্ব কিছু নেই, লোকে মৎস্যের ন্যায় সর্বদা পরস্পরকে ভক্ষণ করে। এদেশে অবশ্য ঠিক অরাজক অবস্থা এখনও হয় নি, তবে মাৎস্য ন্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে, পরস্পর ভক্ষণের সুযোগ দিন দিন বাড়ছে। এখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা হারুন অল রসিদের নির্মম দণ্ডবিধি নেই, কমিউনিস্ট বা ফাসিস্টদের দুর্দান্ত শাসনও নেই, পাঁচ ভূতের লীলাখেলা চলছে। এরই সুযোগ আমরা মাৎস্য সমাজীরা নিয়ে থাকি।

—মাৎস্য সমাজের তুমি একজন কর্তা ব্যক্তি নাকি?

—আমি একজন কর্মী, হাঁপানির বেয়ারাম আছে তাই হাতে কলমে কাজ করতে পারি না, মুখের কথায় যতটুকু সম্ভব করি। বড় বড় মাতব্বর লোক হচ্ছেন এর নির্বাহসমিতির সভ্য, সভাপতি, সচিব আর উপসচিব। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন না, আড়ালে থাকেন। আমি হচ্ছি মাৎস্য সংস্কৃতির একজন ব্যাখ্যাতা আর প্রচারক। যারা আমাদের সমাজে ঢুকতে চায় তাদের আমি যাচাই করি, বাজিয়ে দেখি। যদি দীক্ষার উপযুক্ত মনে হয় তবে মাৎস্য সমাজের ফিলসফিও তাদের বুঝিয়ে দিই।

—ফিলসফিটা কি রকম?

—গোটা কতক মূল সূত্র বলছি শোন।—জোর যার মুলুক তার। উদ্যোগী পুরুষসিংহ অর্থাৎ যোগাড়ে গুণ্ডাকে লক্ষ্মী বরণ করেন। দু-চার জন রোগা-পটকা গুণ্ডা হাজার জন বলবান সজ্জনকে কাবু করতে পারে। দুর্জনরা একজোট হতে পারে কিন্তু সজ্জনরা পারে না, তারা কাপুরুষ, তাদের নীতি হচ্ছে, চাচা আপনা বাঁচা। মাৎস্য সমাজী জনসাধারণের উদ্দেশে বলে—মানতে হবে, মানতে হবে, কিন্তু নিজের বেলায় বলে—মানব না, মানব না। পাপ পুণ্য সব মিথ্যে, শুধু দেখতে হবে পুলিসে না ধরে, আর আত্মীয় বন্ধুরা বেশী না চটে।

—আমাকে নাস্তিক হতে হবে নাকি?

—তার দরকার নেই। ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে যত খুশি গুরুভজন করতে পার। ভক্তিচর্চার সঙ্গে মাৎস্য ন্যায়ের বা চুরি ডাকাতি মাতলামি ব্যভিচার ইত্যাদির কোনও বিরোধ নেই।

—তোমার মাৎস্য ফিলসফিতে নতুন কিছু তো দেখছি না।

—আরও বলছি শোন। কলেজে তোমার তো অঙ্কে বেশ মাথা ছিল। সম্ভাবনা-গণিত অর্থাৎ প্রবাবিলিটি মনে আছে?

—কিছু কিছু আছে।

—কলকাতার রাস্তায় যত লোক চলে তাদের মধ্যে জন কতক প্রতি বৎসরে অপঘাতে মারা যায়। সেজন্যে পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছ কি?

—তা কেন ছাড়ব। বেশীর ভাগ লোকেই তো নিরাপদে যাতায়াত করে, অতি অল্প লোকেই মরে। আমার মরবার সম্ভাবনা খুবই কম।

—ঠিক কথা। যারা হাঁটে তাদের তুলনায় যারা মোটর রেল-গাড়ি বা এয়ারোপ্লেনে চড়ে তাদের অপঘাতের হার ঢের বেশী। প্রাণের ভয়ে এই সব বর্জন করতে বল কি?

—কেন বলব। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো দু-চার জন মারা যায়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলে না।

—উত্তম কথা। বিনা টিকিটে যারা রেলে যাতায়াত করে তাদের কত জনের সাজা হয় জান?

—হয়তো লাখে এক জন ধরা পড়ে, দণ্ড যা দিতে হয় তাও খুব বেশী নয়। কাগজে পড়েছি, গত বৎসরে সাড়ে চার হাজার বার অকারণে শিকল টেনে ট্রেন থামানো হয়েছিল, কিন্তু খুব অল্প লোকেরই বোধ হয় সাজা হয়েছে।

—অতি সত্য কথা। বিনা টিকিটে রেলে চড়া, শিকল টেনে গাড়ি থামানো, গার্ড আর স্টেশন মাস্টারকে ঠেঙানো খুব নিরাপদ কাজ, রিস্ক নগণ্য। পরীক্ষার প্রশ্ন পছন্দ না হলে ছাত্ররা দাঙ্গা করে, চেয়ার টেবিল ভাঙে। ফেল হলে মাস্টারকে ঠেঙায়। কত জনের সাজা হয়?

—বোধ হয় কারও হয় না।

—অর্থাৎ দাঙ্গা করা অতি নিরাপদ। ছেলেরা জানে তাদের

পিছনে মা বাবা আছেন, ঠাকুমা আছেন, হরেক রকম দেশনেতাও আছেন। মন্ত্রীরাও কিছু করতে ভয় পান। ছেলেরা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বটুক ভৈরব, কার সাধ্য তাদের শাসন করে।

—কিন্তু এসব কাজে লাভ কতটুকু হয়?

—বিনা টিকিটে রেলে চড়লে কিছু পয়সা বাঁচে। চেন টানলে, গার্ডকে মারলে বা স্কুল কলেজে দাঙ্গা করলে আর্থিক লাভ হয় না, কিন্তু বাহাদুরি দেখানো হয়, সেটাই মস্ত লাভ। আইন লঙ্ঘনে একটা অনির্বচনীয় আত্মতৃপ্তি আছে। আর্থিক লাভের হিসেব যদি চাও তবে পকেটমারদের খতিয়ান দেখ। হাজার বার পকেট মারলে হয়তো এক বার ধরা পড়ে। এক জনের না হয় সাজা হল, কিন্তু বাকী ন শ নিরেনব্বুই জন তো বেঁচে গেল, তারা ভয় পেয়ে তাদের পেশা ছাড়ে না।

—আমাকে পকেটমার হতে বলছ নাকি?

—না। এ কাজে রোজগার অবশ্য ভালই, কিন্তু ঝাঁকা মুটে রিকশওয়ালা কিংবা পকেটমারের কাজ তোমার মতন ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়। দৈবাৎ যদি ধরা পড় তবে আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, তোমার পক্ষে তা মৃত্যুর বেশী। যারা খাবার জিনিসে বা ওষুধে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, ঘুষ নেয়, মদ চোলাই করে, নোট বা পাসপোর্ট জাল করে, তবিল তসরুপ করে, তাদের অপরাধ গুরুতর, কিন্তু পকেটমারের চাইতে তারা ঢের বেশী রেস্পেক্‌টেব্‌ল গণ্য হয়।

—আমাকে কি করতে হবে তাই স্পষ্ট করে বল।

—মাৎস্য ফিলসফিটা আর একটু বুঝে নাও। নিরাপত্তার বিপরীত অনুপাতে লাভের সম্ভাবনা। ধরা পড়া আর শাস্তির সম্ভাবনা যত কম, লাভও তত কম। রিস্ক যত বেশী, লাভও তত

বেশী। যে কাজে লাখে এক জন ধরা পড়ে তা প্রায় নিরাপদ, যেমন বিনা টিকিটে রেলে চড়া। সরকারী বিজ্ঞাপনে আছে, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের প্রতি বৎসরে ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তার মানে, এই টাকাটা যাত্রীদের পকেটে যায়। তবে মাথা পিছু লাভ অতি অল্প। যাতে দশ হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতেও রিস্ক বেশী নয়, লাভও মন্দ নয়, যেমন ঘুষ, ভেজাল, ট্যাক্স ফাঁকি। যাতে হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতে লাভ বেশ মোটা, যেমন মদ চোলাই, নোট জাল, ডাকাতি। আর যাতে শতকরা এক জন ধরা পড়ে তাতে প্রচুর লাভ, রিস্কও খুব, যেমন দলিল জাল, তবিল তসরুপ। অনেক ধুরন্ধর ব্যবসাদার এই কাজ করে ফেঁপে উঠেছেন, আবার কেউ কেউ ফাঁদেও পড়েছেন।

—সব তো বুঝলুম। এখন আমাকে করতে বল কি?

—একটু একটু করে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, ভয় ভাঙতে হবে। মুরুব্বী অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকও সংগ্রহ করা দরকার, যাঁরা বিপদে রক্ষা করবেন। তুমি দিন কতক বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত কর, মনে সাহস আসবে। সুবিধে পেলেই গার্ড আর স্টেশন মাস্টারকে ঠেঙাবে, অতি নিরাপদ কাজ। সরকার করুণ ভাষায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—ভাই সব, ভাড়া না দিলে রেলগাড়ি চলবে কি করে? ও তো তোমাদেরই জিনিস। রেল-কর্মচারীরা নির্দোষ, তাদের মেরো না। এই মিনতিতে কেউ কর্ণপাত করে না। আরও শোন—বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে যত সব প্রসেশন বেরয় তাতে যোগ দিয়ে স্লোগান আওড়াবে, সুবিধা হলে দাংগা বাধাবে, ইট ছুড়বে। এর ফলে তুমি এক জন লোকসেবক কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে, গুণ্ডোচিত আত্মপ্রত্যয় লাভ করবে, প্রভাবশালী মুরুব্বীদের সুনজরে পড়বে।

—তাঁরা আমার কোন্ উপকারটা করবেন?

—কি না করবেন? যদি ইলেকশনে সাহায্য কর, তোমার চেষ্টার ফলে যদি তাঁরা কৃতকার্য হন তবে কেনা গোলাম হয়ে থাকবেন, পুলিসও তোমাকে খাতির করবে।

—সংসার চলবে কি করে?

—আপাতত তোমাকে একটা খয়রাতী কাজ জুটিয়ে দেব, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করতে হবে। বরাদ্দ টাকার সিকি ভাগ দান করবে, সিকি ভাগ আত্মসাৎ করবে আর বাকী টাকা মাৎস্য সমাজের ফণ্ডে জমা দেবে। এ কাজে রিস্ক কিছুই নেই। কালোবাজার আর ঘুষের দালালিও উত্তম কাজ, তোমাকে তাও জুটিয়ে দেব। তার পর ভেজালওয়ালা আর চোলাইওয়ালাদের সঙ্গেও ভিড়িয়ে দেব। মনে বেশ সাহস এলে একটু আধটু দোকান লুট আর রাহাজানিও অভ্যাস করবে। তার পর তোমাকে আর শেখাবার দরকার হবে না, মাথা খুলে যাবে, বড় বড় অ্যাডভেঞ্চারে নামতে পারবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিবাকর বলল, রাজী আছি, আমাকে মাৎস্য সমাজের মেম্বার করে নাও।

গণপতি বলল, তোমার সুমতি হয়েছে জেনে সুখী হলুম। খয়রাতী কাজটা দিন তিনেকের মধ্যে পেয়ে যাবে। আপাতত এই এক শ টাকা হাওলাত নাও, মাস দুই পরে শোধ দিলেই চলবে। কালীধন মণ্ডলের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া দরকার, চৌকশ লোক, অনেক রকম মতলব আর সাহায্য তার কাছে পাবে। কাল সন্ধ্যাবেলা আবার এখানে এসো, কালীধনও আসবে।

দিবাকরের নূতন জীবন আরম্ভ হল, বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হতে লাগল। প্রথম প্রথম একটু বুক ধড়ফড় করত, কিন্তু তার পর সয়ে গেল। বছর দুই ভালই চলল, তার পর কালীধন এক দিন

তাকে বলল, এ কিছুই হচ্ছে না দিবু-দা, যা বলি শোন। সমাজের সব চাইতে বড় শত্রু হল ধনীদের মেয়েরা, তাদের গহনা যোগাবার জন্যেই বড়লোকরা গরিবদের শোষণ করে। সেকরার দোকান হচ্ছে প্রলোভনের আড়ত, মেয়েদের মাথা খাবার আস্তানা। তাই আমাদের ধ্বংস করতে হবে।

দু দিন পরে সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরে একটা গহনার দোকান লুট হল। লুটের মাল নিয়ে কালীধন পালাল, কিন্তু দিবাকর ধরা পড়ল। সাজা হল দু বছর জেল। তার মুরুব্বী বললেন, এহেহে, বড়ই কাঁচা কাজ করে ফেলেছ হে দিবাকর, এ বুদ্ধি তোমার কেন হল! ভেবো না, দু বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর বেরিয়ে এসে নামটা বদলে ফেলবে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।

দু বছর পরে দিবাকর যখন খালাস হয়ে ফিরে এল তখন তার বউ আর মেয়ে বেঁচে নেই, সে বন্ধনহীন দায়িত্বহীন মুক্তপুরুষ। নিজের নামটা বদলে সে রজনীকান্ত হল এবং অতি সতর্ক কঠোর সাধনার ফলে অল্প কালের মধ্যে মাৎস্য সমাজের শীর্ষে উঠল। এখন সে একজন রাঘব বোয়াল, সামান্য লোকের মত তাকে 'সে' বলা চলবে না, 'তিনি' বলতে হবে।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী এখন স্বহস্তে কোনও তুচ্ছ কর্ম করেন না, চুরি ডাকাতি তবিল ভাঙা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। গুণ্ডা বললে তাঁকে ছোট করা হয়। রাজার উপরে যেমন অধিরাজ, কর্তার উপরে যেমন অধিকর্তা, রজনীকান্ত তেমনি অধিগুণ্ডা, অর্থাৎ গুণ্ডাদের উপদেষ্টা নিয়ন্তা প্রতিপালক ও রক্ষক। ভূতপূর্ব গুরু গণপতি এখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। এক কালে যাঁরা মুরুব্বী ছিলেন তাঁরাই এখন রজনীকান্তের সাহায্যের ভিখারী। তাঁর কৃপা না হলে ইলেকশনে জয়লাভ হয় না, উঁচুদরের দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে করা

যায় না, আইনের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। মিথ্যা প্রচারে কোনও জননেতাই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারেন না। রাম যদি শ্যামকে খুন করে তবে শ্রীরজনীকান্ত অম্লান বদনে ঘোষণা করেন যে শ্যামই রামকে খুন করেছে। তিনি একটু অন্তরালে থাকলেও তাঁর মতন ক্ষমতাশালী লোক আর কেউ নেই। দেশনেতারা সকলেই নিজের নিজের দলে টানবার জন্যে তাঁকে সাধাসাধি করছেন।

১৮৮০

•

উৎকোচ তত্ত্ব

লোকনাথ পাল জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু খুঁতখুঁতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। ছ মাস পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে, জজিয়তির শেষ পর্যন্ত যাতে দুর্নীতির লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ না করে সে সম্বন্ধে তিনি খুব সতর্ক। উৎকোচ তত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। আজ রবিবার, অবসর আছে। সকালবেলা একতলায় তাঁর অফিসঘরে বসে লোকনাথ নোট লিখছেন।—

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা তাঁর কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার দেব। এ হল অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী

ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন, রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ। কিন্তু ধরুন, কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু এক গোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। এ হল সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিন রাত সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সেবা অনুচ্চারিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাইএর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমলপ্রকৃতির লোক হন তবে শ্যাম-গৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করলে বুদ্ধিমান সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়—

লোকনাথের নোট লেখায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এসে বললেন, কেমন আছ লোকনাথ বাবাজী, অনেক কাল তোমাদের দেখি নি। সেকি, চিনতে পারছ না? আরে

আমি হলুম তোমাদের মোহিত পিসেমশাই, বেহালার মোহিত সমজদার। কই রে, পারুল কোথা আছিস, এদিকে আয় না মা।

হাঁকডাক শুনে লোকনাথ-গৃহিণী পারুলবালা এলেন। আগন্তুক লোকটিকে চিনতে তাঁরও কিছু দেরি হল। তার পর মনে পড়লে প্রণাম করে বললেন, মোহিত পিসেমশাই এসেছেন! উঃ কি ভাগ্যি!

অগত্যা লোকনাথও একটা নমস্কার করলেন।

মোহিত সমজদার হাঁক দিলেন, রামবচন, জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আয় বাবা। মোহিতবাবুর অনুচর বাইরে অপেক্ষা করছিল, এখন ঘরে এসে মনিবের সামনে চারটে বাণ্ডিল রাখল।

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স পারুলবালার হাতে দিয়ে মোহিতবাবু বললেন, আসল কাশ্মীরী শাল, তোর জন্যে এনেছি, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা।

শাল দেখে পারুলবালা আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে বললেন, চমৎকার, অতি সুন্দর।

মোহিতবাবু বললেন, লোকনাথ বাবাজী, তোমার তো কোনও শখই নেই, শুধু বই আর বই। তাই একটা ওআলনট কাঠের কিতাব-দান মানে বুক র‍্যাক এনেছি। আর এই বাক্সটায় কয়েক গজ কাশ্মীরী তাফতা আছে, একটা শাড়ি আর গোটা দুই ব্লাউজ হতে পারবে। আর এই চুবড়িটায় কিছু মেওয়া আছে, পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ মনাক্কা এই সব।

কুণ্ঠিত হয়ে লোকনাথ বললেন, আহা কেন এত সব এনেছেন, এ যে বিস্তর টাকার জিনিস। না না, এসব দেবেন না।

মোহিতবাবু বললেন, আরে খরচ করলেই তো টাকা সার্থক হয়।

তোমরা আমার স্নেহপাত্র, তোমাদের দিয়ে যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে দেব না কেন, তোমরাই বা নেবে না কেন?

পারুলবালা বললেন, নেব বই কি পিসেমশাই, আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নেব। তার পর, এখন কোথা থেকে আসা হল? দিল্লি থেকে? পিসিমাকে আনলেন না কেন? তিনি আর ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন তো?

—সব ভাল। তাদের একদিন নিশ্চয় আনব। অনেক কাল পরে কলকাতায় এলুম, বেহালার বাড়িখানা যাচ্ছেতাই নোংরা করে রেখেছে। একটু গোছানো হয়ে যাক তার পর তোর পিসীকে নিয়ে একদিন আসব। নানানানানা, চা-টা কিছু নয়, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। আজ চললুম। ঝড়ের মতন এলুম আর গেলুম, তাই না? কিছু মনে ক'রো না তোমরা, সুবিধে মতন আবার একদিন আসব।

পারুলবালাকে প্রশ্ন করে লোকনাথ জানলেন, মোহিতবাবু তাঁর আসল পিসে নয়, পিসের ভাই। ছেলেবেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসল পিসের সঙ্গে তাঁর এই ভাইও মাঝে মাঝে আসতেন, সেই সূত্রে পরিচয়। তার পর কালে ভদ্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। মোহিতবাবু নানা রকম কারবার ফেঁদেছিলেন। কোনওটারই এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে হয় না। তাঁর অবস্থা ভালই, বড় বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। এখন তিনি কি করেন জানা নেই।

লোকনাথ তাঁর অফিসঘরে বসে ভাবতে লাগলেন। মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মোহিতবাবুর স্নেহ হঠাৎ

উথলে উঠল কেন? বহুকাল আগে লোকনাথ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এই কৃত্রিম পিসেমশাইটিকে দেখে থাকবেন, কিন্তু এখন মনে পড়ে না। আপাতত মোহিতবাবুর কোনও দোষও ধরা যায় না, তিনি বহুমূল্য উপহার দিয়েছেন কিন্তু কিছুই চান নি। হয়তো দিন দুই পরেই একটা অন্যায় অনুরোধ করে বসবেন।

লোকনাথ তাঁর পত্নীকে বললেন, দেখ, তোমার পিসেমশাইএর জিনিসগুলো এখন তুলে রাখ, হয়তো ফেরত দিতে হবে। ওই সব দামী দামী উপহারের জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি, তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

পারুলবালা বললেন, মতলব আবার কি, আমাদের ভালবাসেন তাই দিয়েছেন।

—উনি তোমার আপন আত্মীয় নন, ওঁর নিজের ছেলেমেয়েও আছে, তবে হঠাৎ আমাদের ওপর এত স্নেহ হল কেন?

—খুঁত ধরা তোমার স্বভাব। থাকলই বা নিজের ছেলেমেয়ে, পরের ওপর কি টান হতে নেই? পিসেমশাই বড়লোক, উঁচু নজর, তিনি দামী জিনিস উপহার দেবেন তাতে ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ঘুষ দেন নি।

—যাই হক, তুমি এখন ওগুলো ব্যবহার ক'রো না।

পারুলবালা গরম হয়ে বললেন, কেন করব না? এমন জিনিস তুমি কোনও দিন আমাকে দিয়েছ, না তুমি তার কদর জান? পিসেমশাই যদি ভালবেসে দিয়ে থাকেন তবে তুমি বাদ সাধবে কেন? আর, দামী জিনিস তোমাকে তো দেন নি, আমাকে দিয়েছেন। তুমি যে কাঠের র‍্যাকটা পেয়েছ সেটা না হয় ফেরত দিও।

লোকনাথ চুপ করে গেলেন।

দু'দিন পরে মোহিতবাবু আবার এলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী আসেন নি, একজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন।

মোহিতবাবু বললেন, বাড়ির সব ভাল তো লোকনাথ? ইনি হচ্ছেন শ্রীগিরধারীলাল পাচাড়ী, মস্ত কারবারী লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

লোকনাথ ভাবলেন, এইবারে পিসের গোপন কথাটি প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রস্তাব?

—আচ্ছা বাবাজী, তোমার সার্ভিস শেষ হতে আর কত দেরি?

—এখন এক্সটেনশনে আছি, ছ মাস পরেই শেষ হবে।

—তার পর কি করবে স্থির করেছ?

—কিছুই করব না, লেখাপড়া নিয়ে থাকব।

হাত নেড়ে মোহিতবাবু বললেন, নানানানানা, বসে থাকা ঠিক নয়। তোমার শরীর ভালই আছে, মোটেই বুড়ো হও নি, তবে রোজগার করবে না কেন? শাস্ত্রে বলে, অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। তুমি হচ্ছ প্রাজ্ঞ লোক, অর্থ উপার্জনের সঙ্গেই বিদ্যাচর্চা করবে। যা বলছি বেশ করে বিবেচনা করে দেখ বাবাজী।

মোহিতবাবু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তভাবে নিম্নকণ্ঠে বললেন, এই গিরধারীলাল পাচাড়ীজী হচ্ছেন সিকিম স্টেটের মস্ত বড় কনট্রাক্টার। পশম কম্বল কাঠ মৃগনাভি বড়-এলাচ চিরেতা মাখন ঘি এই সব জিনিস ওখান থেকে এদিকে চালান দেন, আবার সুতী কাপড় চাল গম তেল চিনি নুন কেরোসিন প্রভৃতি ওখানে সপ্লাই করেন। সিকিমের আমদানি রপ্তানি এঁরই হাতে, মহারাজও এঁকে খুব খাতির করেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ নেন। মহারাজ এঁকে বলেছেন,—বলুন না গিরধারীবাবু, নিজেই বলুন না।

গিরধারী বললেন, শুনুন হুজুর। মহারাজ তাঁর বড় আদালতের

জন্যে একজন চীফ জজ চান। ওখানকার লোকদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, মনে করেন সবাই ঘুষখোর। ভাল লোকের খোঁজ নেবার ভার আমাকেই দিয়েছেন, তাই আমি মোহিতবাবুকে ধরেছিলাম। এঁর কাছে শুনেছি আপনিই উপযুক্ত লোক, যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান তেমনি ইমানদার সাধুপুরুষ।

লোকনাথ বললেন, জজের দরকার থাকে তো সিকিম সরকার ভারত সরকারকে লিখলেন না কেন?

মোহিতবাবু বললেন, লিখবেন লিখবেন। মহারাজ নিজে লোক স্থির করবেন তার পর ইণ্ডিয়া গভরমেণ্টকে লিখবেন, অমুককে আমার পছন্দ, তাঁকেই পাঠানো হক। কোনও বাজে লোক দিল্লি থেকে আসে তা তিনি চান না। খুব ভাল পোস্ট, দশ বছরের জন্যে পাকা। এখানকার হাইকোর্ট জজের চাইতে বেশী মাইনে, চমৎকার ফ্রী কোআর্টর্স, ফ্রী মোটরকার, আরও নানা সুবিধে। তুমি যদি রাজী হও তবে গিরধারীজী নিজে গিয়ে মহারাজকে বলবেন।

লোকনাথ বললেন, আমি না ভেবে বলতে পারি না।

—ঠিক কথা, ভাববে বইকি। বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, পারুলের সঙ্গেও পরামর্শ কর, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না, মহারাজ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেট্‌ল করতে চান, ইনি আবার চায়না জাপান বেড়াতে যাবেন কিনা। দিন কতক পরে আবার দেখা করব।

লোকনাথের অস্বস্তি বেড়ে উঠল, তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। এই পিসেমশাইটি অদ্ভুত লোক, কেবল অনুগ্রহই করছেন, এখন পর্যন্ত প্রতিদান কিছুই চাইলেন না। দেখা

যাক, আবার যেদিন আসবেন সেদিন তাঁর ঝুলি থেকে বেরাল বার হয় কিনা।

দু সপ্তাহ পরে মোহিতবাবু একাই এলেন। এসেই ম্লান মুখে বললেন, গিরধারীলালজী আসতে পারলেন না, তাঁর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

আর বল কেন, ভদ্রলোক মহা ফেসাদে পড়েছেন। তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, রামশরণ পোদ্দারের ছেলে শিবশরণের সঙ্গে। কিন্তু শিবশরণের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন বেলে খালাস আছে। ছোকরা এদিকে ভালই, তবে বড়লোকের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে একটু চরিত্রদোষ ঘটেছিল। ব্যাপারটা কাগজে পড়ে থাকবে, প্রায় আট মাস আগেকার ঘটনা। তবলাওয়ালা লেনে তিতলীবাঈ নাচওআলী থাকত, তার কাছে শিবশরণ যেত, তার দুচারজন বন্ধুও যেত। দুপুর রাতে তিতলী যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল তখন কোনও লোক তার পিঠে ছোরা মেরে পালিয়ে যায়। তিতলী বেঁচে আছে, কিন্তু খুবই জখম হয়েছে। পুলিস শিবশরণকেই সন্দেহ করে চালান দেয়। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে শিবশরণ খালাস পাবে, কিন্তু সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছেন। ভাবী জামাইএর এই বিপদে গিরধারীলাল পাচাড়ী অত্যন্ত দমে গেছেন, তাঁর মেয়েও কান্নাকাটি করছে। তবে আমি বেশ ভালই জানি যে ছোকরা একবারে নির্দোষ, তার কোনও বন্ধুই এই কাজ করে সরে পড়েছে।

লোকনাথের মুখ লাল হল। বললেন, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও কথা বলবেন না। সেসন্সে আমার কোর্টেই কেসটা আসবে।

প্রকাণ্ড জিব কেটে মোহিতবাবু বললেন, অ্যাঁ, তাই নাকি?

নানানানানা, তা হলে তোমাকে আর কিছুই বলা চলবে না। তবে গিরধারীর জন্যে আমারও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, মকদ্দমাটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, শিবশরণ খালাস পেলেই গিরধারী-বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সিকিম রওনা হবেন। ব'সো বাবাজী, চললুম।

পাঁচ দিন পরে লোকনাথ তাঁর অফিস ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ গিরধারীলাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর।

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন পাচাড়ীজী, সেদিন মোহিতবাবুর কাছে যা শুনেছি তার পর আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। আপনি এখন যান।

গিরধারীলাল হাত নেড়ে বললেন, আরে রাম রাম, সেসব কথা আপনি একদম ভুলে যান। রামশরণ আমার কেউ নয়, তার বেটা শিব-শরণও কেউ নয়। সে খালাস পাবে কি না পাবে, তাতে আমার কি।

—কেন, সে তো আপনার ভাবী জামাই।

—থুঃ। আমার বেটী বলেছে, ওই লুচ্চা খুনী আসামীকে সে কিছুতেই বিয়া করবে না। এখন হুজুর যদি তাকে ফাঁসিতে লটকে দেন তাতে আমার কোনও ওজর নেই।

লোকনাথ বললেন, ওই কেস আমার কোর্টে আসবে না, অন্য জজের এজলাসে যাবে। আপনাদের প্রস্তাবের পর আমি আর এই মামলার বিচার করতে পারি না।

—বড় আফসোসের কথা। বদমাশটাকে হুজুর যদি কড়া সাজা

দিতেন তো বড় ভাল হত। আচ্ছা, ভগবান সব কুছ মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে আমার বড়ই নুকসান হল, শিউশরণকে সোনার ঘড়ি, হীরা বসানো কোটের বোতাম, আঙটি এই সব দিয়েছিলাম, তা আর ফেরত দেবে না বলেছে। হুজুর যদি ওকে দশ বছর কয়েদ দিতেন তো ঠিক সাজা হত। ওই মোহিতবাবুর মারফত আরও কিছু খরচ হয়ে গেল।

—আমাকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন তারই জন্যে তো?

—হেং হেং, যেতে দিন, যেতে দিন।

—বলুন না, আপনার কত খরচ পড়েছিল?

গিরধারীলাল তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, দুটো শাল এগার শ টাকা, তাফতা দেড় শ টাকা, কিতাবদান পঁয়তাল্লিশ টাকা, মেওয়া ছত্রিশ টাকা, ট্যাক্সি ওগয়রহ ষোল টাকা, মোট তেরো শ সাতচল্লিশ টাকা।

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন, শাল তো একখানা ছিল।

—বলেন কি! একটা আপনার আর একটা শ্রীমতীজীর জন্যে কিনবার কথা। ওই শালা মোহিতবাবু একটা শালের দাম চুরি করেছে। দেখে নেবেন, আমি ওর গলায় পা দিয়ে সাড়ে পাঁচ শ টাকা আদায় করে নেব। আমার সঙ্গে বেইমানি চলবে না, জরুর আদায় করব।

—তা করবেন। বাকী সাত শ সাতানব্বই টাকার একটা চেক আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার জন্যে আপনার লোকসান হবে না। একটা রসিদ লিখে দিন।

গিরধারীলাল যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ও হোহোহো, হুজুর একদম সচ্চা সাধু মহাৎমা আছেন, খুদ ভগবান আছেন, আপনার দয়া ভুলব না।

—সিকিমের চাকরিটাও চাই না।

গিরধারীলাল পাচাড়ী সলজ্জ প্রসন্ন মুখে দন্তবিকাশ করে বললেন, হেঁহেঁহেঁ।

চেক নিয়ে পাচাড়ীজী প্রস্থান করলেন। লোকনাথের গ্লানি দূর হল, তিনি সোৎসাহে উৎকোচ তত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

১৮৮০

প্রাচীন কথা

[এই সব ঘটনার ৭০-৮০% সত্য, ২০-৩০% মিথ্যা, অর্থাৎ স্মৃতিকথায় যতটা ভেজাল দেওয়া দস্তুর তার চাইতে বেশী নেই। নাম সবই কাল্পনিক]

১। বনোয়ারী বাবু

স্থান—উত্তর বিহারের একটি ছোট শহর। কাল—প্রায় সত্তর বৎসর আগে। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌ল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাসে পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাষ্টার বললেন, কি হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে সার বলা রীতি ছিল না, মাষ্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, সবাই চাদরাবাগ যাব।

—সেখানে কিজন্যে যাবি?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেঁই মাষ্টার মশাই ছুটি দিন।

—চারটের সময় ছুটি হলে তার পরে তো যেতে পারিস।

—অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি রায়সাহেবদের বাড়ি দাবা খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাষ্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবুর কথা শুনেছি বটে।

চাদরাবাগ অনেক দূর, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিভূতি-বাবুর বাড়ি পৌঁছুলুম, দাড়িবাবু সেখানেই উঠেছেন। বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে তিনি হুঁকো টানছিলেন। আমাদের দলটিকে দেখে তাঁর বোধ হয় একটু আমোদ হল, নিবিড় কালো দাড়ি-গোঁফের তিমির ভেদ করে সাদা দাঁতে একটু হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। সেকালে ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই দাড়ি রাখতেন, অব্রাহ্মদেরও অনেকের বড় বড় দাড়ি ছিল। কিন্তু সেসব দাড়ি এই নবাগত ভদ্রলোকের দাড়ির কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

বিধু মাষ্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই ছেলেরা আপনাকে দেখতে এসেছে মশাই, কিছুতেই ছাড়বে না, তাই আধ ঘণ্টা আগেই ক্লাস বন্ধ করতে হল।

দাড়িধারী ভদ্রলোকের নাম বনোয়ারী বাবু। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, বেশ বেশ, দেখবে বইকি, দেখাবার জন্যেই তো রেখেছি। যত ইচ্ছে হয় দেখ বাবারা, পয়সা দিতে হবে না।

দাড়িটি বনোয়ারী বাবুর গলায় কম্ফর্টরের মতন জড়ানো ছিল, এখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আলুলায়িত করলেন। হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুলে পড়ল।

সবিস্ময় আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা একযোগে বলে উঠলুম, উ রে বাবা!

বনোয়ারী বাবু বললেন, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? টেনে দেখতে পার, আমার দাড়ি যাত্রার দলের মুনি-ঋষিদের মতন টেরিটিবাজারের নকল দাড়ি নয়। এই বলে তিনি দাড়ি ধরে বারকতক হেঁচকা টান দিলেন।

বিধু মাষ্টার বললেন, আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, আপনার দাড়ির বর্তমান ঝুল কত? সাড়ে তিন ফুট হবে কি?

—থুতনি থেকে পাক্কা বিশ গিরে, মানে পৌনে চার ফুট। পরশু আবদুল দরজী ফিতে দিয়ে মেপেছিল, তার ইচ্ছে একটা মলমলের খোল করে দেয়, যাতে দাড়িতে গরদা না লাগে। আমি তাতে রাজী হই নি।

—এতখানি গজাতে ক বছর লেগেছে?

—তা প্রায় দশ বছর। চব্বিশ বছর বয়সে কামানো বন্ধ করেছিলুম, এখন বয়স হল চৌত্রিশ।

বিধু মাষ্টার তাঁর ক্লাসের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এই ছেলেরা, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে দাড়ি যদি পৌনে চার ফুট হয় তবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কত হবে?

ছেলেদের ঠোঁট নড়তে লাগল, বিড়বিড় শব্দ করে তারা মানসাঙ্ক কষছে। অঙ্কে আমার খুব মাথা ছিল, সকলের আগেই বললুম, সাড়ে সাত ফুট মাষ্টার মশাই।

বিধু মাষ্টার বললেন, করেক্ট। আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, দশ বছর পরে সাড়ে সাত ফুট দাড়ি হলে আপনি সামলাবেন কি করে?

বনোয়ারী বাবু সহাস্যে বললেন, তা তো ভাবি নি, তখন যা হয় করা যাবে, না হয় কিছু ছেঁটে ফেলব।

আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে সপ্রতিভ ছেলে কেষ্ট। সে বলল, না না ছাঁটবেন না, কানের পাশ দিয়ে তুলে মাথায় পাগড়ির মতন জড়ালে বেশ হবে।

বনোয়ারী বাবু বললেন, ঠিক বলেছ হে ছোকরা, পাগড়িই বাঁধব, পশমী শালের চাইতে গরম হবে।

একটু আমতা আমতা করে বিধু মাষ্টার বললেন, কিছু মনে করবেন না বনোয়ারী বাবু, ইয়ে, একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কি বিবাহিত?

—অভ কোর্স। হোআই নট?

—তা হলে, তা হলে—

—আমার স্ত্রী এই দাড়ি বরদাস্ত করেন কি করে—এই তো আপনার প্রবলেম? চিন্তার কারণ নেই মাষ্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশন, বুঝলেন কিনা। তাঁরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাষ্টার আঁতকে উঠে বললেন, কি সর্বনাশ!

—তাঁরটা দাড়ি নয় মশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুন্তলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তার পর বনোয়ারী বাবু বাঙালী ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশী হয়ে বিদায় নিলুম।

২। সত্যবতী ভৈরবী

তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিক্স নিয়ে বেশী লোক মাথা ঘামাত না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চাইতে মাদাম ব্লাভাৎস্কি শশধর তর্কচুড়ামণি আর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে হরনাথ মুখুজ্যের আশ্রম। বিস্তর জমি, অনেক আম কাঁঠাল লিচুর গাছ, একতলা পাকা বাড়ি, তা থেকে কিছু দূরে একটি কালীমন্দির। হরনাথ বাবু কলকাতা

থেকে কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড অয়েল পেণ্টিং আনিয়ে খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভেটকু তেওয়ারী নামক এক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ সেই চিত্রমূর্তির নিত্য সেবা করত। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে হরনাথ বাবু নিজেই পূজা করতেন।

শাস্ত্রে পটপূজার বিধান থাকলেও সাধারণ লোকে মাটি-পাথরের বিগ্রহেই অভ্যস্ত। হরনাথ বাবুর এই টু-ডাইমেনশন-ধারিণী পটরূপা দেবীর উপর প্রথম প্রথম লোকের তেমন শ্রদ্ধা হয় নি। একদিন শোনা গেল, তেওয়ারীর হাত থেকে মা-কালী খাঁড়া কেড়ে নিয়েছেন, হরনাথ বাবু স্বচক্ষে তা দেখেছেন। এর পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দেবী পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত এবং সক্রিয়।

হরনাথ বাবুর আশ্রমে সদাব্রত লেগেই আছে, সব রকম সাধুবাবাই এখানে দিন কতক বাস করতে পারেন। মন্দিরের গায়ে দুটি ছোট ছোট কুঠুরি আছে, সেখানে শুধু গৈরিকধারী কানঢাকা-টুপি-পরা এক নম্বর সন্ন্যাসী মহারাজদের থাকবার অধিকার আছে। মন্দিরের পিছনে কিছু দূরে একটা চালা ঘর আছে, সেখানে জটা-কৌপীন-লোটা-চিমটা-ধারী দু নম্বর সাধুবাবারা আশ্রয় পান। দুই শ্রেণীর সাধুদের মধ্যে সদ্‌ভাব নেই। জটাধারীরা সন্ন্যাসী মহারাজদের বলেন, বিলকুল ভ্রষ্ট্‌ ভণ্ড্‌। অপর পক্ষ বলেন, গঁজেড়ী ভাংখোর মূর্খ্‌।

আশ্রমে কোনও নামজাদা বা নতুন ধরনের সাধু এলে অনেকে দেখতে যেত। আমি, কেষ্ট, আর তার ভাগনে জিতুও মাঝে মাঝে যেতুম, অনেক রকম মজাও দেখতুম। একবার তর্ক করতে করতে এক বাঙালী তান্ত্রিক একজন হিন্দুস্থানী বেদান্তীর কাঁধে চড়ে বসলেন, কিছুতেই নামবেন না। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। অবশেষে হরনাথ বাবু অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করলেন। আর একবার কামরূপ থেকে এক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল

দেখালেন। সামনে একটা আঙটি রেখে তার কিছু দূরে একটা টাকা রাখলেন, তার পর মন্ত্রপাঠ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। আঙটিটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল এবং টাকাকে গ্রেপতার করে নিয়ে ফিরে এল। ওভারসিয়র নীরদবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ম্যাজিক জানতেন, তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। খপ করে সিদ্ধবাবার কান ধরে তিনি একটা সূক্ষ্ম কালো সুতো টেনে বার করলেন। সুতোটা কানে আটকানো ছিল, আঙটি আর টাকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

একদিন খবর এল, কাশী থেকে এক বাঙালিনী ভৈরবী এসেছেন, বয়স হলেও তাঁর রূপ নাকি ফেটে পড়ছে। হিন্দুস্থানীরা তাঁকে বলে মাতাজী সত্যবতী, বাঙালীরা বলে তপস্বিনী ভৈরবী। কেষ্ট জিতু আর আমি দেখতে গেলুম। মন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা বাঘ-ছালের উপর ভৈরবী বসে আছেন আর দু হাতের মুঠোয় একটা কলকে ধরে হুশ হুশ করে তামাক টানছেন। রঙ ফরসা, মাথায় এক রাশ কালো রুক্ষ ফাঁপানো চুল, অল্প পাক ধরেছে, কপালে ভস্মের তিলক। সামনে একটা চকচকে ত্রিশূল পড়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে অনেক দর্শক এল, কেউ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, কেউ খাড়া হয়েই নমস্কার করল। নানা লোক ভৈরবীকে প্রার্থনা জানাল, তিনিও সকলকে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় মুনশী রামভকত এসে করজোড়ে বললেন, মাতাজী, আজ মেরা কোঠিমে জানে কি বাত থি, এক্কা লায়া।

ভৈরবী বললেন, হাঁ বাবা, আমার ইয়াদ আছে, একটু পরেই উঠছি। মুনশীজী, এই দেখ তোমার জন্যে আমি জয়রাম ধূপ বানিয়েছি, হপ্তা খানিক এর ধোঁয়া দিলে তোমার বাড়ির সব আলাই বালাই ভূত প্রেত দূর হবে, তোমার জরুর উপর যে চুড়ৈল (পেতনী) ভর করেছে সেও ভেগে যাবে।

রামভকত কৃতার্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রাণকান্ত বাবু এলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বড় অফিসার, শহরের সকলেই এঁকে খাতির করে। প্রাণকান্ত বাবু এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে বললেন, ভৈরবী মাতাজী, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে তাকান, বড়ই সংকটে পড়েছি, আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

ভৈরবী কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ একটু কুঁচকে গেল, মুখে সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আরে প্রাণকান্ত যে! হরে রাম, হরে রাম! চিনতে পেরেছ তো? ওকি, অমন হতভম্ব হয়ে গেলে কেন, ভূত দেখলে নাকি?

প্রাণকান্ত বাবু নির্বাক বিমূঢ় হয়ে মিটমিট করে চাইতে লাগলেন। ভৈরবী বললেন, সেকি প্রাণকান্ত, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? লজ্জা কেন, এখন তুমিও সাধু আমিও সাধ্বী, দুজনেই পোড়খাওয়া খাঁটী সোনা। ওকি, পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

প্রাণকান্ত বাবু দাঁড়ালেন না, ভিড় ঠেলে সবেগে প্রস্থান করলেন। ভৈরবী স্মিতমুখে বললেন, একটা পুরনো ভূত ভেগে গেল। চল মুনশী রামভকত, এইবার তোমার কুঠিতে যাব।

ভৈরবী চলে গেলে দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠল। এক দল বলল, ভৈরবী না আরও কিছু। ছিছি, এত লোকের সামনে কেলেঙ্কারি ফাঁস করতে মাগীর লজ্জাও হল না। সেই যে বলে, অঙ্গারঃ শতধৌতেন। আর এক দল বলল, অমন কথা মুখে আনতে নেই, উনি এখন পূর্ণমাত্রায় তপঃসিদ্ধা, গৌতমপত্নী অহল্যার মতন পাপশূন্যা, লজ্জা ভয় নিন্দা প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, আগের কথাও লুকুতে চান না। সেই জন্যেই তো সত্যবতী নাম।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্ত বাবু পালিয়ে গেল কেন?

কেষ্ট বলল, বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্ত বাবুর লভ হয়েছিল।

৩। মধু-কুঞ্জ-সংবাদ

সেকালেও বদমাশ ছেলে ছিল, কিন্তু এখনকার মতন তারা কলেকটিভ অ্যাকশন নিতে জানত না। মাষ্টাররা তখন বেপরোয়া ভাবে বেত লাগাতেন, ছেলেরা তা শিক্ষারই অঙ্গ মনে করত, মা-বাপরাও আপত্তি করতেন না।

বেত মারায় আমাদের মধুসূদন মাষ্টারের জুড়ি ছিল না। দোষ করলে তো মারতেনই, বিনা দোষেও শুধু হাতের সুখের জন্যে মারতেন। তিনি একটি নতুন শাস্তি আবিষ্কার করেছিলেন—রসমোড়া, অর্থাৎ পেটের চামড়া খামচে ধরে মোচড় দেওয়া।

মধু মাষ্টার বাঙলা পড়াতেন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, কালো রঙ, একমুখ দাড়িগোঁফ, তাতে চেহারাটি বেশ ভীষণ দেখাত। তখনও তাঁর বিবাহ হয় নি, বাড়িতে শুধু বিধবা বিমাতা আর দশ-এগারো বছরের একটি আইবুড়ো বৈমাত্র ভগ্নী। শুনতুম দেশে তাঁর যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে, শুধু ছেলে ঠেঙাবার লোভেই নানা জায়গায় মাষ্টারি করেছেন।

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম কুঞ্জ। বয়স চোদ্দ-পনরো, আমাদের চাইতে ঢের বড়। একটু পাগলাটে, লেখাপড়ায় অত্যন্ত কাঁচা, তিন বৎসর প্রমোশন পায় নি।

মধু মাষ্টার চারুপাঠ পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ বলল, মাষ্টার মশাই, একবার বাইরে যাব, পেচ্ছাব পেয়েছে।

ধমক দিয়ে মধু মাষ্টার বললেন, মিথ্যে কথা। রোজ এই সময় তোর বাইরে যাবার দরকার হয়। নিশ্চয় তামাক কি বাডসাই খাস।

একটু পরে কুঞ্জ আবার বলল, উঃ, আর থাকতে পারছি না, ছুটি দিন মাষ্টার মশাই। ফিরে এলে বরং আমার মুখ শুঁখে দেখবেন তামাক খেয়েছি কিনা।

—খবরদার, চুপ করে বসে থাক। ছুটি পাবি না।

মুখ কাঁচুমাচু করে কাতর কণ্ঠে কুঞ্জ বলল, উহুহুহু। তার পর উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মধু মাষ্টার তাকে ধরে ফেলে একটা রসমোড়া দিলেন তার পর সপাসপ বেত মারতে লাগলেন। কুঞ্জ চিৎকার করে বলল, আমার দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু। বেত এড়াবার জন্যে সে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, মধু মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে বেত চালাতে লাগলেন।

আমরা তারস্বরে বললুম, মাষ্টার মশাই, সমস্ত ঘর ভিজে নোংরা হয়ে গেল, আপনার কাপড়েও ছিটে লেগেছে। মেথর ডাকতে হবে।

মধু মাষ্টার তখনও উন্মত্ত হয়ে বেত চালাচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ মাটিতে শুয়ে পড়ে গোঁগোঁ করতে লাগল। আমরা বললুম, কুঞ্জ মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে।

কেষ্ট তাড়াতাড়ি এক ফালি কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কুঞ্জর নাকের কাছে ধরে বলল, এখনও মরে নি, দেখুন না কাগজটা ফরফর করছে। মারের চোটে কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর একটু পরেই মরে যাবে। ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, আমরা চ্যাংদোলা করে কুঞ্জকে তার বাড়ি

নিয়ে যাব, সেখানে মরাই তো ভাল। আপনি মেথর ডাকান আর চান করে কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন।

অগত্যা মধু মাষ্টার ক্লাস বন্ধ করলেন।

পরদিন কুঞ্জ স্কুলে এল না। মধু মাষ্টার বললেন, আজ বিকেলে ওর বাড়িতে খোঁজ নিস তো, কেমন আছে ছোঁড়া।

ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমরা একসঙ্গে আবৃত্তি করছি— সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্বময়। হঠাৎ কুঞ্জ তার মাকে নিয়ে উপস্থিত হল। মা খুব লম্বা চওড়া মহিলা, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়ে পরেছেন, মাথায় কাপড় না থাকারই মধ্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নাক সিঁটকে একবার চারদিকে উঁকি মারলেন, যেন আরসোলা কি নেংটি ইঁদুর খুঁজছেন। তার পর আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মোধো মাষ্টার কোন্‌টে রে?

একালের চাইতে তখন ছেলেদের মধ্যে শিভালরি ঢের বেশী ছিল। আমরা সকলেই সসম্ভ্রমে আঙুল বাড়িয়ে মধু মাষ্টারকে শনাক্ত করলুম।

কুঞ্জর মা সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কান ধরে বললেন, ইষ্টুপিট মুখপোড়া বাঁদর! তোর বেতগাছটা কোথা রে?

আমরা বললুম, ওই যে, চেয়ারে ওঁর পাশেই রয়েছে। কুঞ্জর মা কিন্তু আমাদের নিরাশ করলেন। বেতটা বাঁ হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লাগালেন না, শুধু ডান হাত দিয়ে মধু মাষ্টারের দাড়ি-ভরা গালে গোটা চারেক থাবড়া লাগালেন। তার পর বেতটা নিয়ে কুঞ্জর হাত ধরে গটগট করে চলে গেলেন।

গোলমাল শুনে মাষ্টাররা সবাই আমাদের ক্লাসে এলেন। হেড-মাষ্টার মশাই বললেন, বাড়ি যা তোরা।

পরদিন থেকে মধু মাষ্টার গোবেচারার মতন বিনা বেতেই পড়াতে লাগলেন।

ছ মাস পরেই কুঞ্জর সঙ্গে মধু মাষ্টারের একটা পাকা রকম মিটমাট হয়ে গেল। রেল স্টেশনের মালবাবু যামিনী ঘোষাল ছিলেন কুঞ্জর দূর সম্পর্কের ভাই, তাঁর সঙ্গে মধু মাষ্টারের বৈমাত্র বোন ভুতির বিয়ে স্থির হল। মধু মাষ্টার যথাসাধ্য আয়োজন করলেন, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিবাহসভায় সবাই বরের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরপক্ষের একজন খবর আনল—যামিনী বলেছে, মধু চামারের বোনকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেষ্ট আমাদের চুপিচুপি বলল, কুঞ্জই ভাঙচি দিয়েছে।

বিয়েবাড়িতে প্রচণ্ড হইচই উঠল। মধু মাষ্টারের বিমাতা কুঞ্জর মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রক্ষা কর দিদি, এখন বর কোথায় পাব, তোমার ছেলে কুঞ্জকে আদেশ কর।

কুঞ্জর মা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বামুনের জাতধর্ম বাঁচাতে হবে বইকি। এই কুঞ্জ, তোর ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এই চেলিটা পর।

কুঞ্জ বলল, ভুতি যে বিচ্ছিরি!

তার মা বললেন, আহা, কি আমার কার্ত্তিক ছেলে রে! ওঠ বলছি, নয়তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

কুঞ্জর বাবা বললেন, ছেলেটার যখন আপত্তি তখন জোর করে বিয়ে দেবার দরকার কি?

কুঞ্জর মা বললেন, যাও যাও, তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন?

কুঞ্জ তবু ইতস্তত করছে দেখে কেষ্ট তাকে চুপিচুপি বলল, বিয়েটা করে ফেল কুঞ্জ, অনেক সুবিধে। সোনার আঙটি পাবি, রুপোর ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাবি, ক্লাসে প্রমোশনও পেয়ে যাবি। আর, মধু মাষ্টার মশাই তোর কে হবেন জানিস তো? শালা।

কুঞ্জ আর আপত্তি করে নি।

১৮৮০

উৎকণ্ঠা স্তম্ভ

বিলিতী খবরের কাগজে যাকে অ্যাগনি কলম বলা হয় তাতে এক শ্রেণীর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বহুকাল থেকে ছাপা হয়ে আসছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে বাঙলা কাগজে সে রকম বিজ্ঞাপন কদাচিৎ দেখা যেত, কিন্তু আজকাল ক্রমেই বাড়ছে। 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' শীর্ষক স্তম্ভে তার অনেক উদাহরণ পাবেন। ইংরেজীতে যা অ্যাগনি কলম, বাঙলায় তারই নাম উৎকণ্ঠা স্তম্ভ।

কয়েক মাস আগে দৈনিক যুগানন্দ পত্রের উৎকণ্ঠা স্তম্ভে উপরি উপরি দু দিন এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গিয়েছিল—

বাবা পানু, যেখানেই থাক এখনই চলে এস, টাকার দরকার হয় তো জানিও। তোমার মা নেই, বুড়ো বাপ আর পিসীমাকে এমন কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমি যাকে চাও তার সঙ্গেই যাতে তোমার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। কিছু ভেবো না, শীঘ্র ফিরে এস।—তোমার পিসীমা।

চার দিন পরে উক্ত কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

এই পেনো, পাজী হতভাগা শুওর, যদি ফিরে আসিস তবে জুতিয়ে লাট করে দেব। আমার দেরাজ থেকে তুই সাত শ টাকা চুরি করে পালিয়েছিস, শুনতে পাই বিপিন নন্দীর ধিঙ্গী মেয়ে লেত্তি তোর সঙ্গে গেছে। তুই ভেবেছিস কি? তোকে ফেরাবার জন্যে সাধাসাধি করব? তেমন বাপই আমি নই। তোকে ত্যাজ্যপুত্র করলুম, তোর চাইতে ঢের ভাল ভাল ছেলের আমি জন্ম দেব, তার জন্যে ঘটক লাগিয়েছি।—তোর আগেকার বাপ।

সাত দিন পরে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল—

পানু-দা, চিঠিতে লিখে গেছ তিন দিন পরেই ফিরবে, কিন্তু আজও দেখা নেই। গেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমার মফ চেন আর ব্রোচ নিয়ে গেছ কেন? তুমি যে চোর তা ভাবতেই পারি নি। এখন তোমাকে চিনেছি, চেহারাটাই চটকদার, তা ছাড়া অন্য গুণ কিছুই নেই। অল্প দিনের মধ্যে বিদায় হয়েছ ভালই, কিন্তু আর ফিরে এসো না। ভেবেছ আমার বুক ভেঙে যাবে, তোমাকে ফেরাবার জন্য সাধাসাধি করব? সে রকম ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে আমি নই, নিজের পথ বেছে নিতে পারব।—লোত্তি।

উৎকণ্ঠা স্তম্ভের এই সব বিজ্ঞাপন পড়ে পাঠকবর্গ বিশেষত যাদের ফুরসত আছে, মহা উৎকণ্ঠায় পড়ল। অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গবেষণা করতে লাগল, ব্যাপারটা কি। একজন বিচক্ষণ সিনেমার ঘুণ বললেন, বুঝছ না, এ হচ্ছে একটা ফিল্মের বিজ্ঞাপন, প্রথমটা শুধু পবলিকের মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার পর খোলসা করে জানাবে আর বড় বড় পোস্টার সাঁটবে। আর একজন প্রবীণ সিনেমা রসিক বললেন, ছকু চৌধুরী যে নতুন ছবিটা বানাচ্ছে—মুঠো মুঠো প্রেম, নিশ্চয় তারই বিজ্ঞাপন। আর একজন বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না, এ হচ্ছে চা-এর বিজ্ঞাপন, দু দিন পরেই লিখবে—আমার নাম চা, আমাকে নিয়মিত পান করুন, তা হলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। আর একজন বললেন, চা নয়, এ হচ্ছে বনস্পতির বিজ্ঞাপন। বুড়োর দল কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত মানলেন না। তাঁদের মতে এ হচ্ছে মামুলী পারিবারিক কেলেঙ্কারির ব্যাপার, সিনেমা দেখে আর উপন্যাস পড়ে সমাজের যে অধঃপতন হয়েছে তারই লক্ষণ।

কয়েক দিন পরেই উৎকণ্ঠা স্তম্ভে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

লোত্তি দেবী, আপনার মনের বল দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার

ভাল নাম লতিকা কি ললিতা তা জানি না, আমাকেও আপনি চিনবেন না, তবু সাহস করে অনুরোধ করছি, আপনার ব্যর্থ অতীতকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করুন, প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আমরা দুজনে স্বর্ণময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অগ্রসর হব। আমি আপনার অযোগ্য সাথী নই, এই গ্যারাণ্টি দিতে পারি। আরও অনেক কিছু লিখতুম, কিন্তু কাগজওয়ালারা ডাকাত, এক লাইনের রেট পাঁচ সিকে নেয়, সেজন্যে এখানেই থামতে হল। উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলুম, আপনার ঠিকানা পেলে মনের কথা সবিস্তারে লিখব।—কৃষ্ণধন কুণ্ডু (বয়স ২৬), এঞ্জিনিয়ার, গণেশ কটন মিল, পারেল, বম্বে।

দু দিন পরে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

শ্রীমান পানুর পিতা মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম আপনি আবার বিবাহ করিবেন, সে কারণে ঘটক লাগাইয়াছেন। যদি ইতিমধ্যে অন্য কাহারও সঙ্গে পাকা কথা না হইয়া থাকে তবে আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবেন। আমি এখানকার ফিমেল জেলের সুপারইনটেনডেণ্ট, বয়স চল্লিশের কম, হাজার দশেক টাকা পুঁজি আছে। চাকরি আর ভাল লাগে না, বড়ই অপ্রীতিকর, সেজন্য সংসার ধর্ম করিতে চাই। যদি আমার পাণিগ্রহণে সম্মত থাকেন তবে সত্বর জানাইবেন, কারণ আরও দুই ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছে।—ডকটর মিস সত্যভামা ব্যানার্জি, পি-এইচ-ডি, ফিমেল জেল, চুন্দ্রিগড়।

এর পর উৎকণ্ঠা স্তম্ভে আর কোনও বিজ্ঞাপন দেখা গেল না, কিন্তু ব্যাপারটি অনেক দূর গড়িয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে যা জানা গেছে তাই সংক্ষেপে বলছি।

বিপিন নন্দীর মেয়ে লেত্তি (ভাল নাম লজ্জাবতী) কৃষ্ণধন কুণ্ডুকে বিয়ে করেছে। পানু অর্থাৎ প্রাণতোষের বুড়ো বাপ মনোতোষ ভটচাজ ডকটর সত্যভামাকে বিয়ে করেছেন। অগত্যা পানুর পিসীমা কাশী চলে গেছেন।

বোম্বাই থেকে পানু তার বাপকে চিঠি লিখেছে—

পূজনীয় বাবা, তোমার টাকার জন্যে ভেবো না, যা নিয়েছিলুম সুদ সুদ্ধ ফেরত দেব। আমি মোটেই কুপুত্তুর নই, ফেলনা বংশধর নই, তোমার বংশ আমি উজ্জ্বল করেছি। আমার নাম এখন প্রাণতোষ নয়, সুন্দরকুমার। নয়নসুখ ফিল্ম কম্পানিতে জয়েন করেছি, বেশ ভাল রোজগার। এখানে আমার খুব নাম, সবাই বলে সুন্দরকুমারের মতন খুবসুরত অ্যাক্টর দেখা যায় না। শুনলে অবাক হবে, বিখ্যাত স্টার মিস গুলাবা ভেরেন্দী আমাকে বিবাহ করেছেন। তাঁর কত টাকা আছে জান? পাঁচ লাখ বাহান্ন হাজার, তা ছাড়া তিনটে মোটর কার। আগামী রবিবার বম্বে মেলে আমি সস্ত্রীক কলকাতায় পৌঁছুব। আমাদের জন্যে দোতলার বড় ঘরটা সাহেবী স্টাইলে সাজিয়ে রেখো, ফুলদানিতে এক গোছা রজনীগন্ধা যেন থাকে। ভয় নেই, বেশী দিন থাকব না, হপ্তা খানেক পরেই বোম্বাইএ ফিরে আসব।

মনোতোষ ভটচাজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডকটর সত্যভামা বললেন, তা ছেলেটা আসছে আসুক না, তুমি গালাগাল মন্দ দিও না বাপু। পানু আমাদের বাহাদুর ছেলে।

কৃষ্ণধন কুণ্ডু ছুটি নিয়ে তার বউ লেত্তির সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। পানু সস্ত্রীক বাড়ি আসছে শুনে লেত্তি চুপ করে থাকতে পারল না, মনোতোষ ভটচাজের বাড়িতে উপস্থিত হল। পাড়ার আরও

অনেকে এল, সিনেমা স্টার গুলাবাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু পানুকে একলা দেখে সবাই নিরাশ হয়ে গেল।

মনোতোষ বললেন, একা এলি যে? তোর বউ কোন চুলোয় গেল?

মাথা চুলকে পানু বলল, সে আসতে পারল না বাবা। হঠাৎ মস্কো থেকে একটা তার এল, তাই এক মাসের জন্যে সোবিএত রাষ্ট্রে কলচরাল টুর করতে গেছে।

লেত্তি বলল, সব মিছে কথা। আমরা সদ্য বোম্বাই থেকে এসেছি, সেখানকার সব খবর জানি। গুলাবা ভেরেন্দী তোমাকে বিয়ে করবে কোন্ দুঃখে? দু বছর আগে নবাবজাদা সোভানুল্লার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তাঁকে তালাক দিয়ে গুলাবা সম্প্রতি লগনচাঁদ বজাজকে বিয়ে করেছে। তুমি তো গ্রাণ্ট রোডে একটা ইরানী হোটেলে বয়-এর কাজ করতে, চুরি করেছিলে তাই তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মনোতোষ গর্জন করে বললেন, দূর হ জোচ্চোর ভ্যাগাবণ্ড, নয়তো জুতিয়ে লাট করে দেব।

সত্যভামা বললেন, আহা, ছেলেটাকে এখনি তাড়াচ্ছ কেন, আগে একটু জিরুক। বাবা পানু, ভেবো না, তোমার একটা হিল্লে আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার ফ্রেণ্ড মিষ্টার হায়দর মুস্তাফা কলকাতায় এসেছেন। দক্ষিণ বর্মায় মৌলমিন শহরে তাঁর বিরাট পোলট্রি ফার্ম আছে, আমি তাঁকে বললেই তোমাকে তার ম্যানেজার করে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও, পরশু তিনি রওনা হবেন, তাঁর সঙ্গেই তুমি যাবে। টাকার জন্যে ভেবো না, আমি তোমার জাহাজ ভাড়া আর কিছু হাত খরচ দেব।

অতঃপর সকলের উৎকণ্ঠার অবসান হল। তবে পানুর হিল্লে এখনও পাকাপাকি লাগে নি। সাত দিন পরেই সে মুস্তাফা সাহেবের কিছু টাকা চুরি করে সিংগাপুরে পালিয়ে গেল। সেখানে পিপল্‌স চায়না হোটেলে একটা কাজ যোগাড় করেছে, খদ্দেরদের খাবার পরিবেশন করতে হয়। হোটেলের মালিক মিস ফুক-সান তাকে সুনজরে দেখেন। পানুর আশা আছে, ভাল করে খোশামোদ করতে পারলে মিস ফুক-সান তাকে পোষ্য পতির পদে প্রমোশন দেবেন।

১৮৮০

দীনেশের ভাগ্য

জয়গোপাল সেন, জীবনকৃষ্ণ দত্ত, আর গোলোকবিহারী হালদার কাছাকাছি বাস করেন। জয়গোপাল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চা করেন, আত্মা ভগবান আর পরকাল সম্বন্ধে তাঁর বাঁধাধরা মত আছে। জীবনকৃষ্ণ গোঁড়া পাষণ্ড নাস্তিক, বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আত্মা ভগবান পরকাল মানেন না। তাঁর মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে দেশ-কালের একটি গাণিতিক জগাখিচুড়ি, তাতে নিরন্তর ছোট বড় তরঙ্গ উঠছে আর ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি হরেক রকম অতীন্দ্রিয় কণিকা আধসিদ্ধ খুদের মতন বিজবিজ করছে; মানুষের চেতনা সেই খিচুড়িরই একটু ধোঁয়া অর্থাৎ তুচ্ছ বাই-প্রডক্ট। গোলোকবিহারী হচ্ছেন আধা-আস্তিক আধা-পাষণ্ড, তিনি কি মানেন বা মানেন না তা খোলসা করে বলেন না। তিন জনেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, সুতরাং মতিগতি বদলাবার সম্ভাবনা কম। মতের বিরোধ থাকলেও এঁরা পরম বন্ধু, রোজ সন্ধ্যাবেলা জয়গোপালের বাড়িতে আড্ডা দেন। সম্প্রতি দশ দিন আড্ডা বন্ধ ছিল, কারণ জয়গোপাল কাশী গিয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি ফিরেছেন, সন্ধ্যার সময় পূর্ববৎ আড্ডা বসেছে।

গোলোক হালদার প্রশ্ন করলেন, তোমার শালা দীনেশের খবর কি জয়গোপাল, এখন একটু সামলে উঠেছে? আহা, অমন চমৎকার মানুষ, কি শোকটাই পেল! এক মাসের মধ্যে স্ত্রী আর বড় বড় দুটি ছেলে কলেরায় মারা গেল, আবার কুবের ব্যাংক ফেল হওয়ায় দীনুর গচ্ছিত টাকাটাও উবে গেল। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন, সবই শ্রীহরির ইচ্ছা, কেন

কি করেন তা আমাদের বোঝবার শক্তি নেই, মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এখান থেকে দীনেশের নড়বার ইচ্ছে ছিল না, প্রায় জোর করে তাকে কাশীতে তার খুড়তুতো ভাই শিবনাথের কাছে রেখে এলুম। শিবনাথ অতি ভাল লোক, দীনুকে গয়া প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার ঘুরিয়ে আনবে। তীর্থভ্রমণই হচ্ছে শোকের সব চাইতে ভাল চিকিৎসা। দীনুর মেয়ে আর ছোট ছেলেটিকে আমাদের কাছেই রেখেছি।

অন্যান্য দিন তিন বন্ধু সমাগত হবামাত্র আড্ডাটি জমে ওঠে, অর্থাৎ তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়। জয়গোপালের শালা দীনেশের বিপদের জন্যে আজ সকলেই একটু সংযত হয়ে আছেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বেশীক্ষণ সামলাতে পারলেন না। বললেন, ওহে জয়গোপাল, তোমার দয়াময় হরির আক্কেলটা দেখলে তো? দীনেশের মতন গোবেচারা ভালমানুষ নিষ্পাপ লোককে এমন থেঁতলে দিলেন কেন? কর্মফল বললে শুনব না। পূর্বজন্মে দীনু যদি কিছু দুষ্কর্ম করেই থাকে তার জন্যে তো তোমার ভগবানই দায়ী, তিনিই তো সব করান।

গোলোক হালদার চোখ টিপে বললেন, ব্যাখ্যা অতি সোজা। ভগবানের সাধ্য নেই যে মানুষের ফ্রী উইলে হস্তক্ষেপ করেন। দীনেশ তার স্বাধীন ইচ্ছাতেই পূর্বজন্মে দুষ্কর্ম করেছিল, তারই ফল এজন্মে পেয়েছে। কি বল জয়গোপাল?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ও সব গোঁজামিল চলবে না। হিন্দু মতে পুনর্জন্ম আর কর্মফল মানবে, আবার খ্রীষ্টানী মতে ফ্রী উইল মানবে, এ হতে পারে না। তোমার গীতাতেই তো আছে—ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থাকেন আর যন্ত্রারূঢ়বৎ চালনা করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছেন কুমোর আর মানুষ হচ্ছে কুমোরের চাকে মাটির ডেলা। মানুষের পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সমস্তের জন্যে ঈশ্বরই দায়ী। তাঁকে দয়াময় বলা মোটেই চলবে না।

জয়গোপাল বললেন, তর্ক করলে শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরে সরে যান, বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কৃপাসিন্ধু মঙ্গলময়। আমরা জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র প্রাণী, তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের অসাধ্য। শুধু এইটুকুই জানি, তিনি যা করেন তা জগতের মঙ্গলের জন্যেই করেন। কান্তকবি তাই গেয়েছেন—জানি তুমি মঙ্গলময়, সুখে রাখ দুঃখে রাখ যাহা ভাল হয়।

অট্টহাস্য করে জীবনকৃষ্ণ বললেন, বাহবা, চমৎকার যুক্তি। একেই বলে বেগিং দি কোয়েশ্চন। কোনও প্রমাণ নেই অথচ গোড়াতেই মেনে নিয়েছ যে ভগবান আছেন এবং তিনি পরম দয়ালু। যদি সুখ পাও তবে বলবে, এই দেখ ভগবানের কত দয়া। যদি দুঃখ পাও তবে কুযুক্তি দিয়ে তা ঢাকবার চেষ্টা করবে। হিন্দু বলবে কর্মফল, খ্রীষ্টান বলবে ফ্রী উইল আর অরিজিনাল সিন। কুকুর বেরাল ছাগল বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে দেখলে বলবে, আহা ভগবানের কত দয়া, সন্তানের জন্যে মাতৃবক্ষে অমৃতরসের ভাণ্ড সৃষ্টি করছেন। কিন্তু দীনেশের মতন সাধুলোক যখন শোক পায় আর সর্বস্বান্ত হয়, হাজার হাজার মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বা যুদ্ধে মরে, তখন তো মুখ ফুটে বলতে পার না—উঃ, ভগবান কি নিষ্ঠুর! তোমরা ভক্তরা হচ্ছ খোশামুদে একচোখো, যুক্তির বালাই নেই, শুধু অন্ধ বিশ্বাস। আচ্ছা জয়গোপাল, কবি ঈশ্বর গুপ্ত তোমার মাতৃকুলের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন না? তিনি ভগবানকে অনেকটা চিনতে পেরেছিলেন, তাই লিখেছেন—

হায় হায় কব কায় কি হইল জ্বালা,
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা। ...
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম,
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

গোলক হালদার বললেন, ওহে জীবনকেষ্ট, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। তোমার মুশকিল হয়েছে এই যে তুমি জগতের সমস্ত ব্যাপারের আর মানুষের সমস্ত চিন্তার সামঞ্জস্য করতে চাও। তোমাদের বিজ্ঞান অচেতন জড় প্রকৃতির মধ্যেই পুরো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় নি, সচেতন মানুষের চিত্ত তো দূরের কথা। যুক্তিবাদী চার্বাকরা বড় বেশী দাম্ভিক হয়। তোমরা মনে কর, অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রন থেকে অতি বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত সবই আমরা মোটামুটি বুঝি, সবই যুক্তি খাটিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি। তবে মানুষের চিত্তের বেলায় অবুদ্ধি আর অযুক্তি সইব কেন?

জীবন। চিত্ত মানে কি?

গোলোক। চিত্তের অনেক রকম মানে হয়। আমাদের মনের যে অংশ সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ দয়া ঘৃণা ইত্যাদি অনুভব করে তাকেই চিত্ত বলছি। চিত্তের ব্যাপারে যুক্তি আর বুদ্ধি খাটে না।

জীবন। মনোবিজ্ঞানীরা সেখানেও নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

গোলোক। বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি, মানুষের চিত্ত এখনও দুর্গম রহস্য। আচ্ছা, বল তো, দাশরথি চন্দরের শ্রাদ্ধ সভায় তুমি তার অত গুণকীর্তন করেছিলে কেন?

জীবন। কেন করব না। দাশরথিবাবু বিস্তর দান করেছেন, আমাদের পাড়ার কত উন্নতি করেছেন, রাস্তা টারম্যাক করিয়েছেন, ইলেকট্রিক ল্যাম্প বসিয়েছেন, আমাদের অ্যাসেসমেণ্ট কমিয়েছেন, পাড়ায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গোলোক। লোকটি প্রচণ্ড মাতাল আর লম্পট ছিল, গুণ্ডা পুষত, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত—এ সব ভুলে গেলে কেন?

জীবন। কিছুই ভুলি নি। মৃত লোকের শ্রাদ্ধসভায় শুধু শ্রদ্ধা জানানোই দস্তুর, দোষের ফর্দ দেওয়া অসভ্যতা।

গোলোক। তার মানে তুমিও সময় বিশেষে একচোখো হও। জয়গোপাল যদি তার ইষ্টদেবতার শুধু সদ্‌গুণই দেখে আর তাতেই আনন্দ পায় তবে তুমি দোষ ধরবে কেন?

জয়গোপাল হাত নেড়ে বললেন, চুপ কর গোলোক, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। ভগবানের লীলার সঙ্গে মানুষের আচরণ তুলনা করা মহাপাপ, যাকে বলে ব্ল্যাসফেমি।

গোলোক। বেগ ইওর পার্ডন, আমার অপরাধ হয়েছে। আচ্ছা জীবনকেষ্ট, বন্দে মাতরম্‌ আর জন-গণ-মন গান তোমার কেমন লাগে?

জীবন। ভালই লাগে। তবে বঙ্গমাতা ভারতমাতা ভারতভাগ্যবিধাতা কেউ আছেন তা মানি না।

গোলোক। আমাদের এই বাঙলা দেশ সুজলা সুফলা বহুবলধারিণী তারিণী ধরণী ভরণী—এ সব বিশ্বাস কর? ভারতভাগ্যবিধাতা আমাদের মঙ্গল করবেন তা মান?

জীবন। না, ও সব শুধু কবিকল্পনা। কবিদের যা আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে যা হবে আশা করেন, তাই তাঁরা মনগড়া দেবতায় আরোপ করেন। এ হল পোয়েটিক লাইসেন্স, কবিতায় যুক্তি না থাকলেও দোষ হয় না।

গোলোক। অর্থাৎ কবিদের উইশফুল থিংকিংএ তোমার আপত্তি নেই। ভক্তরাও এক রকম কবি, তাঁদের ইষ্টদেবতাও ইচ্ছাময়, জয়গোপাল যা ইচ্ছা করে তাই ভগবানে আরোপ করে আনন্দ পায়।

আবার হাত নেড়ে জয়গোপাল বললেন, তুমি কিছুই জান না। ভক্তরা মোটেই আরোপ করেন না, সচ্চিদানন্দ ভগবানের সত্য স্বরূপই উপলব্ধি করেন। তোমাদের মতন চার্বাকদের সে শক্তি নেই।

জীবন। আচ্ছা গোলোক, তুমি সত্যি করে বল তো, ভগবান মান কিনা।

গোলোক। হরেক রকম ভগবান আছেন, কতক মানি কতক মানি না। ঐতিহাসিক আর আধা-ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের ভগবান বলে মানি, যেমন বুদ্ধ, যীশু, আর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ। এঁরা করুণাময়, কিন্তু সর্বশক্তিমান নন। দেখতেই পাচ্ছ, এঁদের চেষ্টায় বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। করুণাময় আর সর্বশক্তিমান পরস্পরবিরোধী, সে রকম ভগবান কেউ নেই। মানুষের কোনও গুণ বা দোষ ভগবানে থাকতে পারে না, তিনি ভালও নন মন্দও নন, দয়ালুও নন নিষ্ঠুরও নন। তাঁর কোনও ইচ্ছা উদ্দেশ্য বা মতলব থাকা অসম্ভব। যে অপূর্ণ, যার কোনও অভাব আছে, তারই উদ্দেশ্য থাকে। পূর্ণব্রহ্মের অভাব নেই, কিছু করবারও নেই, তিনি স্থান কাল শুভ অশুভ সমস্তের অতীত। তিনি একাধারে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একটি নগণ্য কণা এই পৃথিবী, তারই একটা অতি নগণ্য কীটাণুকীট আমি, ব্রহ্মের স্বরূপ এর চাইতে বেশী বোঝা আমার সাধ্য নয়।

জয়গোপাল। গোলোকের কথা কতকটা ঠিক। কিন্তু সাধকদের হিতার্থে ব্রহ্মের যে রূপ গুণ কল্পনা করা হয় তাও সত্য। ভগবানের মঙ্গলময় রূপ বোঝা মানুষের অসাধ্য নয়, শ্রদ্ধাবান ভক্ত তা বুঝতে পারেন। আমাদের দীনেশ নিষ্পাপ, আপাতত যতই দুঃখ পাক, মঙ্গলময়ের করুণা থেকে সে বঞ্চিত হবে না।

এক মাস পরের কথা। সন্ধ্যাবেলা তিন বন্ধু যথারীতি মিলিত হয়েছেন। ডাকপিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল। জয়গোপাল বললেন, এ যে দীনেশের চিঠি, অনেক দিন পরে লিখেছে।

জয়গোপাল চিঠিটা খুলে পড়লেন, তার পর মুখভঙ্গী করে বললেন, ছি ছি ছি।

জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, হয়েছে কি?

জয়গোপাল। হয়েছে আমার মাথা। কিছুদিন ধরে একটা ফিস-ফিস গুজগুজ শুনছিলুম দীনেশ নাকি আবার বিয়ে করবে। তার মেয়ে তো কেঁদেই অস্থির। বলেছে, সৎমায়ের কাছে থাকব না, এখনই আমার বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও। ছোট ছেলেটা বলেছে, ব্যাট দিয়ে নতুন মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেব। তাদের পিসী আমার স্ত্রী বলেছেন, সৎমায়ের কাছে যেতে হবে না, তোরা আমার কাছেই থাকবি। আমি গুজবে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু দীনেশ এই চিঠিতে খোলসা করে লিখেছে।

গোলোক। একটু শোনাও না কি লিখেছে।

জয়গোপাল। চার পাতায় বিস্তর লিখেছে। তার বক্তব্যের যা সার তাই পড়ছি শোন।—শিবনাথের ছোট শালী চামেলীর গুণের তুলনা হয় না। আমার ইনফ্লুএঞ্জার সময় যে সেবাটা করেছে তা বলবার নয়। সকলের মুখে এক কথা—চামেলীই আমাকে বাঁচিয়েছে। শিবনাথ নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরে বসল, চামেলীকে নাও, সে তো তোমারই। সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কুশ্রীও বলা চলে না। তার বয়স চব্বিশের মধ্যে, একটু বেশী তোতলা, তাই এ পর্যন্ত বিয়ে হয় নি। আমার বিশ্বাস ডাক্তার অনিল মিত্র তাকে সারাতে পারবেন। তার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন, তাঁর উইল অনুসারে চামেলী প্রায় দশ হাজার টাকার সম্পত্তি পেয়েছে। আমার নিজের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, চুলে একটু পাকও ধরেছে, কিন্তু এখানে সবাই বলছে, আমাকে নাকি চল্লিশের কম দেখায়। অগত্যা রাজী হলুম। দেখি, ভগবানের দয়ায় আবার সংসার পেতে যদি একটু শান্তি পাই।...এই রকম অনেক কথা দীনেশ লিখেছে। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জাও হল না! ছি ছি ছি!

গোলোক। ছি ছি করবার কি আছে, বিয়ে করেছে তো হয়েছে কি?

জয়গোপাল। শাস্ত্রে আছে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। আরে তোর দুটো ছেলে না হয় গেছে, কিন্তু একটা তো বেঁচে আছে, মেয়েও একটা আছে, তবে কোন্ হিসেবে আবার বিয়ে করলি? তোর বয়স হয়েছে, দেবার্চনা ধ্যান-ধারণা পরমার্থচিন্তা এই সব করেই তো শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতিস। বুড়ো বয়সে একি মতিচ্ছন্ন হল!

গোলোক। ওহে জয়গোপাল, তুমি নিজের কথার খেলাপ করছ। তোমার শ্রীভগবান যে মঙ্গলময় তা তো দেখতেই পেলে। শেষ পর্যন্ত দীনেশের ভালই করলেন, তরুণী ভার্যা দিলেন, আবার দশ হাজার টাকাও দিলেন। আর, তোতলা স্ত্রী পাওয়া তো মহা ভাগ্যের কথা, চোপা শুনতে হবে না, দাম্পত্য কলহেরও ভয় নেই। তবে তোমার খেদ কিসের?

জীবন। তোমাদের শ্রীভগবান কিন্তু হরগোবিন্দ সাহার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করেন নি। রেলের কলিশনে তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব মারা গেল, হরগোবিন্দর দুটো পা কাটা গেল। লোকটি অতি সজ্জন, বিস্তর টাকা, কিন্তু বেচারা অনেক চেষ্টা করেও আর একটা বউ যোগাড় করতে পারে নি, একটা বোবা কালা কানা খোঁড়াও জোটে নি।

গোলোক। হরগোবিন্দকে চিনি না, তার জন্যে ভাববার দরকার নেই। আমাদের দীনেশ কিন্তু ভাগ্যবান। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি— সে গোঁফ কামিয়ে তরুণ হয়েছে, চুলে কলপ লাগিয়েছে, জরি পাড় ধুতি আর সোনালী গরদের পঞ্জাবি পরেছে, জগদানন্দ মোদক খাচ্ছে, তার ঠোঁটে একটু বোকা বোকা হাসি ফুটেছে।

ভূষণ পাল

ভূষণ পাল তার এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রতিবেশী নবীন সাঁতরাকে খুন করেছিল, সেসন্স জজ তার ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আসামীকে যারা চেনে তারা সকলেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাদের আশা ছিল বড় জোর আট-দশ বছর জেল হবে। কিন্তু ভূষণের উকিলের কোনও যুক্তি হাকিম শুনলেন না। বললেন, আসামী ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খুন করে নি, অনেকদিন থেকে মতলব এঁটে মারবার চেষ্টায় ছিল, অবশেষে সুযোগ পেয়ে ছোরা বসিয়েছে। আসামীর আক্রোশের যতই কারণ থাক তাতে তার অপরাধের গুরুত্ব কমে না। জুরি একমত হয়ে ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করলেও একটু দয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু হাকিম দয়া করলেন না, চরম দণ্ডই দিলেন।

ভূষণ পাল হিন্দুস্থান মোটর ওআর্ক্‌স্‌-এ মিস্ত্রীর কাজ করত। ফাটা তোবড়া মডগার্ড বেমালুম মেরামত করতে তার জুড়ী ছিল না, সেজন্য মাইনে ভালই পেত। সেখানে তার গুরুস্থানীয় হেডমিস্ত্রী ছিল সাগর সামন্ত। কারখানার লোকে তাকে সামন্ত মশাই বলে ডাকে, কিন্তু একটা দূর সম্পর্ক থাকায় ভূষণ তাকে সাগর কাকা বলে।

রায় বেরুবার পরদিন বিকাল বেলা সাগর সামন্ত আলীপুর জেলে তার প্রিয় শাগরেদ ভূষণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে সাগর বলল, কি করে তোকে বাঁচাব রে ভূষণ।

ভূষণ বলল, অমন করে তুমি কেঁদো না সাগর কাকা, তা হলে আমার মাথা বিগড়ে যাবে।

চোখ মুছতে মুছতে সাগর বলল, উকিল বাবু এখনও আশা ছাড়েন নি, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। বললেন, আপীল করবেন।

—আপীল আবার কেন। যা হবার হয়ে গেছে, আর কিছুই করবার দরকার নেই, মিথ্যে টাকা বরবাদ হবে।

—বরবাদ নয় রে, তোকে বাঁচাবার জন্যে খরচ হবে। পোষ্টাপিসে তোর যে পঁয়ত্রিশ শ টাকা ছিল তোর কথামত তার সবটাই তুলে নিয়ে আমার কাছে রেখেছি। তা থেকে দু শ আন্দাজ খরচ হয়েছে, বাকী সবই তো রয়েছে। তাতে না কুলয় তো আমরা সবাই চাঁদা তুলে আপীলের খরচ যোগাব।

—উকিল আদিত্যবাবু কত টাকা নিয়েছেন?

—নিজের জন্য একপয়সাও নেন নি, শুধু আদালতের খরচ বাবদ কিছু নিয়েছেন। বলেছেন, ভূষণকে যদি বাঁচাতে পারতুম তবেই ফী নিতুম। তিনি আর তাঁর বন্ধু উকিলরা সবাই বলেছেন, আপীল করলে নিশ্চয় রায় পালটে যাবে—লম্বা জেল হলেও তোর প্রাণটা তো রক্ষা পাবে।

—খবরদার আপীল করবে না। দশ-বিশ বছর জেলে থাকার চাইতে চটপট মরা ঢের ভাল।

—নবীনকে ছোরা মেরে খুন করলি কেন রে হতভাগা? তার চাইতে যদি পাঁচসেরী হুম্বর দিয়ে হাঁটুতে এক ঘা লাগাতিস তা হলে নবুনে মরত না, চিরটা কাল খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকত আর ভাবত— হাঁ, ভূষণ পাল সাজা দিতে জানে বটে। তোরও বড় জোর দু-চার বছর জেল হত।

—নব্‌নেকে একবারে সাবড়ে দিয়েছি বেশ করেছি। তার ভূতটা যদি আমার কাছে আসে তাকেও গলা টিপে মারব।

—রাম রাম, এসব কথা মুখে আনিস নি ভূষণ, যা হয়ে গেছে একদম ভুলে যা। শুধু হরিনাম কর, মা-কালীকে ডাক, যাতে পরকালে কষ্ট না পাস। এখন বল তোর টাকার বিলি ব্যবস্থা কি করবি। টাকা তো কম নয়, তোর বদখেয়াল ছিল না তাই এত জমাতে পেরেছিস। উইল করতে চাস তো উকিল বাবুকে বলব।

—উইল আবার কি করতে। আমার যা পুঁজি সবই তো তোমার জিম্মেয় রয়েছে। তুমিই তো বিলি করবে। আন্দাজ তেত্রিশ শ আছে তো? তুমিই বল না সাগর কাকা কি করা উচিত।

—সব টাকা তোর পরিবারকে দিবি।

সজোরে মাথা নেড়ে ভূষণ বলল, এক পয়সাও নয়।

—আচ্ছা বউকে না হয় না দিলি, তোর এক বছরের ছেলেটা কি দোষ করল? তাকে তো মানুষ করতে হবে।

—সে আমার ছেলে নয়, সবাই তা জানে। দেখ নি, তার চোখ ঠিক নব্‌নের মতন ট্যারা? তারা এখন আছে কোথায়?

—যে দিন তুই গ্রেপতার হলি তার পরদিনই তোর বউ ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

—বাপের তো অবস্থা ভালই। বেটী আর বেটীর পো-কে খুব পুষতে পারবে।

—তোর বাসায় কেউ নেই খবর পেয়েই আমি তালা লাগিয়েছি। পাশে যে ঘুঁটেওয়ালী যশোদা বুড়ী থাকে তাকে দিয়ে মাঝে মাঝে ঘর-দোর সাফ করাই।

—ও বাসা রেখে কি হবে, ভাড়া চুকিয়ে দাও। দেখ সাগর কাকা, ভুলো বলে একটা বুড়ো কুকুর রোজ আমার কাছে ভাত খেতে আসত। সে বেচারা হয়তো উপোস করছে।

—না না, যশোদাই তাকে খাওয়াচ্ছে।

—বুড়ী নিজেই তো খেতে পায় না। সাগর কাকা, যশোদাকে দু শ টাকা দিও।

—বলিস কিরে, কুকুরের জন্য অত টাকা কেন?

—যশোদা বড় গরিব, ভুলোকে খাওয়াবে নিজেও খাবে। আর একটা কথা—ভটচাজ মশাইকে জিজ্ঞেস করে আমার শ্রাদ্ধের খরচটা তাঁকে দিও। তিনিই যা হয় ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ না হয়।

বিষণ্ন মুখে সাগর বলল, শ্রাদ্ধ হবার জো নেই রে ভূষণ। ভটচাজ বলেছে, অপঘাত মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ হয় না, ফাঁসি যে অপঘাত। তবে একটা প্রাশ্চিত্তির করা খুব দরকার বলেছেন, আর বারোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।

—না, প্রাশ্চিত্তির আর ভূত ভোজন করাতে হবে না। আর শোন সাগর কাকা, নবুনের বউকে দেড় হাজার টাকা দেবে। তার খুকী গোপালীকে মানুষ করবার জন্যে।

—অবাক করলি ভূষণ! নিজের পরিবারকে কিছু দিবি নি, যাকে মেরেছিস সেই নবুনের মেয়ের জন্যেই দেড় হাজার দিবি? ও বুঝেছি, এই হচ্ছে তোর প্রাশ্চিত্তির।

—কিচ্ছু বোঝ নি, প্রাশ্চিত্তির করবার কোনও গরজ আমার নেই। ওই গোপালীটা ছিল আমার বড্ড ন্যাওটো, কাকা বলতে পারত না, আআ বলে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠত।

—বেশ, গোপালীর মাকে দেড় হাজার টাকা দেব। তোর ওপর তার মর্মান্তিক রাগ থাকার কথা, তবে খুব কষ্টে আছে, টাকাটা নিতে আপত্তি করবে না। এটা ভালই করলি ভূষণ, এতে তোর পাপ অনেকটা ক্ষয় হয়ে যাবে। তার পর আর কাকে কি দিতে চাস?

—বাকী সবটা তুমি নিও।

আবার হাউ হাউ করে কেঁদে সাগর বলল, তোর টাকা আমি কোন প্রাণে নেব রে? সৎপাত্রে দান কর, পরকালে তোর ভাল হবে।

—তোমার চাইতে সৎপাত্র পাব কোথা। আমার বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই, শুধু তুমিই আছ। আচ্ছা সাগর কাকা, মরবার পরে যমদূত আমাকে সোজা নরকে নিয়ে যাবে তো?

—তা আমার মনে হয় না। আমাদের হাকিমদের চাইতে যমরাজ ঢের বেশী বোঝেন। অন্যায় সইতে না পেরে রাগের মাথায় একটা পাপ করে ফেলেছিস, তার সাজাও মাথা পেতে নিচ্ছিস, আপীল পর্যন্ত করতে চাস না। তোর পাপ বোধ হয় এখানেই খণ্ডে গেল। আদিত্য উকিল বাবু কি বলেছে জানিস? ইংরেজ বিদেয় হয়েছে, কিন্তু নিজেদের ফৌজদারী আইন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। ওদের দেশে নবনের অপরাধটা কিছুই নয়, তার জন্যে কেউ খেপে গিয়ে মানুষ খুন করে না, বড় জোর খেসারত দাবি করে আর তালাকের দরখাস্ত করে। ওদের বিচারে নবনের চাইতে তোর অপরাধ ঢের বেশী। কিন্তু যদি সেকালের হিঁদু রাজা কি মুসলমান বাদশার আমল হত তবে তুই বেকসুর খালাস পেতিস। দেখ ভূষণ, আমার মনে হয় তোর স্বর্গে ঠাঁই হবে না বটে, কিন্তু নরক ভোগ থেকে তুই রেহাই পাবি।

—স্বর্গেও নয় নরকেও নয়, তবে ঠাঁই হবে কোথায়?

—তুই আবার জন্মাবি।

—সে তো খুব ভালই হবে। সাগর কাকা, কাকীকে বলো আমার জন্যে যেন খান কতক কাঁথা সেলাই করে রাখে।

—কাঁথা কি হবে রে?

—শুনেছি মরবার সময় মানুষের যে মনোবাঞ্ছা থাকে পরের জন্মে তাই ফলে। ফাঁসির সময় আমি কেবল তোমার আর কাকীর কথা ভাবব। দেখো, ঠিক তোমাদের ছেলে হয়ে জন্মাব। এমন বাপ মা পাব কোথায়? দাগী ছেলেকে ঘেন্না করে ফেলে দেবে না তো সাগর কাকা?

জেলের ওআর্ডার এসে জানাল, সময় হয়ে গেছে, ভিজিটারকে এখন চলে যেতে হবে।

সাগর সামন্ত ভূষণকে একবার জড়িয়ে ধরল, তার পর ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল।

১৮৮০

দাঁড়কাগ

কাঞ্চন মজুমদার অনেক কাল পরে তার বন্ধু যতীশ মিত্রের আড্ডায় এসেছে। তাকে দেখে সকলে উৎসুক হয়ে নানারকম সম্ভাষণ করতে লাগল।—আরে এস এস, এত দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? ব্যারিস্টারিতে খুব রোজগার হচ্ছে বুঝি, তাই গরিবদের আর মনে পড়ে না?

প্রবীণ পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, বে-থা করলে, না এখনও আইবুড় কার্তিক হয়ে আছ?

কাঞ্চন বলল, কই আর বিয়ে হল সর্বজ্ঞ মশাই, পাত্রীই জুটছে না।

উপেন দত্ত বলল, আমাদের মতন চুনো পুঁঠি সকলেরই কোন্ কালে জুটে গেছে, শুধু তোমারই জোটে না কেন? অমন মদনমোহন চেহারা, উদীয়মান ব্যারিস্টার, দেদার পৈতৃক টাকা, তবু বিয়ে হয় না? ধনুকভাঙা পণ কিছু আছে বুঝি? এদিকে বয়স তো হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, চুল উঠে গিয়ে ডিউক অভ এডিনবরোর মতন প্রশস্ত ললাট দেখা দিচ্ছে, খুঁজলে দু-চারটে পাকা চুলও বেরুবে। পাত্রীরা তোমাকে বয়কট করেছে নাকি?

—বয়কট করলে তো বেঁচে যেতুম। ষোল থেকে বত্রিশ যেখানে যিনি আছেন সবাই ছেঁকে ধরেছেন। গণ্ডা গণ্ডা রূপসী যদি আমার প্রেমে পড়তে চান তবে বেছে নেব কাকে?

উপেন বলল, উঃ, দেমাকের ঘটাখানা দেখ! তুমি কি বলতে চাও গণ্ডা গণ্ডা রূপসীর মধ্যে তোমার উপযুক্ত কেউ নেই? আসল কথা, তুমি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যে কোনও

গণ্ডগোল আছে, নিজেকে অদ্বিতীয় রূপবান গুণনিধি মনে কর তাই পছন্দ মত মেয়ে কিছুতেই খুঁজে পাও না। হয়তো মেয়েরাই তোমার কথা শুনে ভড়কে যায়।

—মিছিমিছি আমার দোষ দিও না উপেন। বিয়ের জন্যে আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, কিন্তু যাকে তাকে তো চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ একটা মিনিমম স্ট্যাণ্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কলচারও বাদ দিতে পারি না। সুশিক্ষিত অথচ শান্ত নম্র মেয়ে হবে, বিলাসিনী উড়নচণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা খাণ্ডারনী হলে চলবে না। একটু আধটু নাচুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হরদম নাচিয়ে মেয়ে আমার পছন্দ নয়। মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার করা কি সোজা কথা? এ পর্যন্ত তো খুঁজে পাই নি।

—পাবার কোনও আশা আছে কি?

—তা আছে, সেই জন্যেই তো যতীশের কাছে এসেছি। আচ্ছা যতীশ, গণেশমুণ্ডা জায়গাটা কেমন? তুমি তো মাঝে মাঝে সেখানে যেতে। শুনেছি এখন আর নিতান্ত দেহাতী পল্লী নয়, অনেকটা শহরের মতন হয়েছে।

যতীশ বলল, তোমার নির্বাচিতা প্রিয়া ওখানেই আছেন নাকি?

—নির্বাচন এখনও করি নি। শম্পা সেন ওখানকার নতুন গার্ল স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস। মাস চার-পাঁচ আগে নিউ আলীপুরে আমার ভাগনীর বিয়ের প্রীতিভোজে একটু পরিচয় হয়েছিল। খুব লাইকলি পার্টি মনে হয়, তাই আলাপ করে বাজিয়ে দেখতে চাই।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, শম্পা সেনও তো তোমাকে বাজিয়ে দেখবেন। তিনি তোমাকে পছন্দ করবেন এমন আশা আছে?

—কি বলছেন সর্বজ্ঞ মশাই! আমি প্রোপোজ করলে রাজী হবে না এমন মেয়ে এদেশে নেই।

উপেন বলল, তবে অবিলম্বে যাত্রা কর বন্ধু, তোমার পদার্পণে তুচ্ছ গণেশমুণ্ডা ধন্য হবে। গিয়ে হয়তো দেখবে তোমাকে পাবার জন্যে শম্পা দেবী পার্বতীর মতন কৃচ্ছ্র সাধনা করছেন।

—ঠাট্টা রাখ, কাজের কথা হক। ওখানে শুনেছি হোটেল নেই, ডাকবাঙলাও নেই। যতীশ, তুমি নিশ্চয় ওখানকার খবর রাখ। একটা বাসা যোগাড় করে দিতে পার?

যতীশ বলল, তা বোধ হয় পারি, তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়শাশুড়ী তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওখানে থাকেন, মেয়ে কি একটা সরকারী নারী-উদ্যোগশালা না সর্বাত্মক শিল্পাশ্রমের ইন চার্জ। নিজের বাড়ি আছে, মা আর মেয়ে দোতলায় থাকেন, একতলাটা যদি খালি থাকে তো তোমাকে ভাড়া দিতে পারেন।

—তবে আজই একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম কর, আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে চাই। একটা চাকর সঙ্গে নেব, সেই রান্না আর সব কাজ করবে। উত্তর এলেই আমাকে টেলিফোনে জানিও। আচ্ছা, সর্বজ্ঞ মশাই, আজ উঠলুম, যাবার আগে আবার দেখা করব।

উপেন বলল, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, তবে ফিরে এসে অবশ্যই ফলাফল জানিও, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু শুধু হাতে যদি এস তো দুও দেব।

কাঞ্চন মজুমদার চলে যাবার পর পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, ওর মতন দাম্ভিক লোকের বিয়ে কোনও কালে হবে না, হলেও ভেঙে যাবে। কাঞ্চনের জোড়া ভুরু সুলক্ষণ নয়। বিষবৃক্ষের হীরা,

চোখের বালির বিনোদ বোঠান, ঘরে বাইরের সন্দীপ, গৃহদাহর সুরেশ, সব জোড়া ভুরু। তারা কেউ সংসারী হতে পারে নি।

উপেন বলল, সন্দীপ আর সুরেশের জোড়া ভুরু কোথায় পেলেন?

—বই খুঁজলেই পাবে, না যদি পাও তো ধরে নিতে হবে। শম্পা সেনের যদি বুদ্ধি থাকে তবে নিশ্চয় কাঞ্চনকে হাঁকিয়ে দেবে।

যতীশ বলল, শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি, গণেশমুণ্ডায় দাঁড়কাগের ঠোকর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে।

উপেন প্রশ্ন করল, দাঁড়কাগটি কে?

—সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আর শ্রীহীন সেজন্যে লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।

উপেন বলল, তা হলে কাঞ্চন নাজেহাল হবে কেন? কোনও সুন্দরী মেয়েই এপর্যন্ত তাকে বাঁধতে পারে নি, তোমার কুৎসিত শালীকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এই দাঁড়কাগ তমিস্রার হিস্টরি একটু শুনতে পাই না? অবশ্য তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মারা যান। অবস্থা ভাল, বীডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি আছে। মায়ের সঙ্গে সেখানে থাকত আর স্কটিশ চার্চে পড়ত। স্কুল কলেজের আর পাড়ার বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাত, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত, দণ্ডবায়স হুশ। এখানে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আই-এস-সি পাস করেই মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে যায়। সেখানে ওর

চেহারা কেউ লক্ষ্য করত না, খেপাতও না। মাদ্রাজ থেকে বি-এস-সি আর এম-এস-সি পাস করে, তার পর তার পিতৃবন্ধু এক বিহারী মন্ত্রীর অনুগ্রহে গণেশমুণ্ডায় নারী-উদ্যোগশালায় চাকরি পায়। খুব কাজের মেয়ে, তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিষ্টি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় অতি ব্রিলিয়ান্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা ওখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআ-দিদি। গুণগ্রাহী অ্যাডমায়ারারও দু-চার জন আছে, কিন্তু কেউ বেশী দূর এগুতে পারে নি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর ওর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালবাসে।

কাঞ্চনকে স্বাগত জানিয়ে তমিস্রা বলল, কোনও ভাল জায়গায় না গিয়ে এই তুচ্ছ গণেশমুণ্ডায় হাওয়া বদলাতে এলেন কেন? আমাদের এই বাড়ি অতি ছোট, আসবাবও সামান্য, অনেক অসুবিধা আপনাকে সইতে হবে।

কাঞ্চন বলল, ঠিক হাওয়া বদলাতে নয়, একটু কাজে এসেছি। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না। একটা রান্নার জায়গা আমার চাকরকে দেখিয়ে দেবেন, আর দয়া করে কিছু বাসন দেবেন। যতীশকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তাতে তো ভাড়ার রেট জানান নি।

—যতীশবাবু আমাদের কুটুম্ব, আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব আপনিও কুটুম্ব। ভাড়া নেব কেন? রান্নার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে না, আমাদের হেঁসেলেই খাবেন। অবশ্য বিলাতের রিৎস-কার্লটন বা দিল্লির অশোকা হোটেলের মতন সার্ভিস পাবেন না, সামান্য ভাত ডাল তরকারিতেই তুষ্ট হতে হবে। মাছ এখানে দুর্লভ, তবে চিকেন পাওয়া যায়।

—না না, এ বড়ই অন্যায় হবে মিস নাগ। বাড়ি ভাড়া নেবেন না, আবার বিনা খরচে খাওয়াবেন, এ হতেই পারে না।

তমিস্রা স্মিতমুখে বলল, ও, বিনামূল্যে অতিথি হলে আপনার মর্যাদার হানি হবে? বেশ তো, থাকা আর খাওয়ার জন্যে রোজ তিন টাকা দেবেন।

—তিন টাকায় থাকা আর খাওয়ার খরচ কুলোয় না, আমার চাকরও তো আছে।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচ সাত দশ যাতে আপনার সংকোচ দূর হয় তাই দেবেন। টাকা খরচ করে যদি তৃপ্তি পান তাতে আমি বাধা দেব কেন। দেখুন, আমার মায়ের কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে, নীচে নামতে পারবেন না। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করে একবার ওপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

—অবশ্যই করব। আচ্ছা, আপনাদের এই গণেশমুণ্ডায় দেখবার জিনিস কি কি আছে?

—লাল কেল্লা নেই, তাজমহল নেই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটা ঝরনা আছে, ঝম্পাঝোরা। কাছকাছি একটা পাহাড় আছে, পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লবীরা সেখানে বোমার ট্রায়াল দিত। তাদের দলের একটি ছেলে তাতেই মারা যায়, তার কঙ্কাল নাকি এখনও একটা গভীর খাদের নীচে দেখা যায়। ওই যে মাঠ দেখছেন ওখানে প্রতি সোমবারে একটা হাট বসে, তাতে ময়ূর হরিণ ভালুকের বাচ্চা থেকে মধু মোম ধামা চুবড়ি পর্যন্ত কিনতে পাবেন।

—আর আপনার নিজের কীর্তি, মহিলা-উদ্যোগশালা না কি, তাও তো দেখতে হবে। গাড়িটা আনতে পারি নি, হেঁটেই সব দেখব। আপনি সঙ্গে থেকে দেখাবেন তো?

—দেখাব বইকি। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত পর্যটক এখানে ক জন আসে। বিকাল বেলায় আমার সুবিধে, সকালে দুপুরে কাজ থাকে। যেদিন বলবেন সঙ্গে যাব।

তিন রকম লোক ডায়ারি লেখে—কর্মবীর, ভাবুক আর হামবড়া। কাঞ্চনেরও সে অভ্যাস আছে। রাত্রে শোবার আগে সে ডায়ারিতে লিখল—পুওর তমিস্রা নাগ, তোমার জন্যে আমি রিয়ালি সরি। যেরকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কথাবার্তায় মনে হয় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। দেখতে বিশ্রী হলেও তোমার একটা চার্ম আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে। কালই আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

পরদিন সকালে কাঞ্চন বলল, আপনাকে এখনই বুঝি কাজে যেতে হবে? যদি সুবিধা হয় তো বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবেন। এখন আমি একটু একাই ঘুরে আসি। আচ্ছা, শম্পা সেনকে চেনেন, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?

তমিস্রা বলল, খুব চিনি, চমৎকার মেয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—কিছু আছে। যখন এসেছি তখন একবার দেখা করে আসা যাক। বেশ সুন্দরী, নয়? আর চার্মিং। শুনেছি এখনও হার্ট-হোল আছে, জড়িয়ে পড়ে নি।

—হাঁ, রূপে গুণে খাসা মেয়ে। ভাল করে আলাপ করে ফেলুন, ঠকবেন না।

স্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে শম্পা বাস করে। কাঞ্চন সেখানে গিয়ে তাকে বলল, গুডমর্নিং মিস সেন, চিনতে পারেন? আমি কাঞ্চন মজুমদার, সেই যে নিউ আলীপুরে আমার ভগিনীপতি রাঘব দত্তর বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে আছে তো?

শম্পা বলল, মনে আছে বইকি। আপনি হঠাৎ এদেশে এলেন যে? এখন তো চেঞ্জের সময় নয়।

—এখানে একটু দরকারে এসেছি। ভাবলুম, যখন এসে পড়েছি তখন আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা অন্যায় হবে। মনে আছে, সেদিন আমাদের তর্ক হচ্ছিল, গেটে বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়? আমি বলেছিলুম, গেটের কাছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে পারেন না, আপনি তা মানেন নি। ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমাদের তর্ক সেদিন শেষ হয় নি।

—এখানে তারই জের টানতে চান নাকি? তর্ক আমি ভালবাসি না, আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, আমারটা আমার থাকুক, তাতে গেটে কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

—আচ্ছা, তর্ক থাকুক। আমি এখানে নতুন এসেছি, দ্রষ্টব্য যা আছে সব দেখতে চাই। আপনি আমার গাইড হবেন?

—এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। আপনি উঠেছেন কোথায়?

—তমিস্রা নাগকে চেনেন? তাঁদেরই বাড়িতে আছি।

—তমিস্রাকে খুব চিনি। সেই তো আপনাকে দেখাতে পারবে, আমার চাইতে ঢের বেশী দিন এখানে বাস করছে, সব খবরও রাখে। আমার সময়ও কম, বেলা দশটার সময় স্কুলে যেতে হয়।

—সকালে ঘণ্টা খানিক সময় হবে না?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব, কিন্তু সব দিন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। কাল সকালে আসতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে কাঞ্চন চলে গেল। দুপুর বেলা ডায়ারিতে লিখল—মিস শম্পা সেন, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে আসবার আগে ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলুম, সবাই বলেছে এখনও তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড় নি। আমি এখানে এসে দেরি না করে তোমার কাছে গিয়েছি, এতে তোমার খুব ফ্ল্যাটার্ড আর রীতিমত উৎফুল্ল হবার কথা। তুমি সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার চাইতে তোমার মূল্য ঢের কম। রূপে গুণে বিত্তে আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে? মনে হচ্ছে তুমি একটু অহংকেরে, মানুষ চেনবার শক্তিও তোমার কম।

কাঞ্চন প্রায় প্রতিদিন সকালে শম্পার সঙ্গে আর বিকালে তমিস্রার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। গণেশমুণ্ডায় একটি মাত্র বড় রাস্তা, তারই ওপর তমিস্রাদের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই গোটাকতক দোকান পড়ে, তার মধ্যে বড় হচ্ছে রামসেবক পাঁড়ের মুদীখানা আর কহেলিরাম বজাজের কাপড়ের দোকান। এইসব দোকানের সামনে দিয়েই কাঞ্চন আর তার সঙ্গিনী শম্পা বা তমিস্রার যাতায়াতের পথ। দোকানদাররা খুব নিরীক্ষণ করে ওদের দেখে।

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে বলল পাঁড়েজী, এই ফর্দটা নাও, সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দিও। চিনিতে যেন পিঁপড়ে না থাকে।

রামসেবক বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদিমণি, সব খাঁটী

মাল দিব। এই বাবুসাহেবকে তো চিনছি না, আপনাদের মেহমান (অতিথি)?

—হাঁ, ইনি এখানে বেড়াতে এসেছেন।

—রাম রাম বাবুজী। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিস পাবেন, মহীন বাসমতী চাউল, খাঁটী ঘিউ, পোলাওএর সব মসালা, কাশ্মীরী জাফরান, পিস্তা বাদাম কিশমিশ। আসেটিলীন বাত্তি ভি আমি রাখি।

কাঞ্চন বলল, ও সবের দরকার আমার নেই।

—না হুজুর, ভোজের দরকার তো হতে পারে, তখন আমার বাত ইয়াদ রাখবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন বলল, লোকটা আমাকে ভোজন-বিলাসী ঠাউরেছে।

তমিস্রা হেসে বলল, তা নয়। ডিকেন্স-এর সারা গ্যাম্প-কে মনে আছে? তার পেশা ধাইগিরি আর রোগী আগলানো। সদ্য বিবাহিত বর-কনে গির্জা থেকে বেরুচ্ছে দেখলেই সারা গ্যাম্প তাদের হাতে নিজের একটা কার্ড দিত। তার মানে, প্রসবের সময় আমাকে খবর দেবেন। গণেশমুণ্ডার দোকানদাররাও সেই রকম। কুমারী মেয়ে কোনও জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে দেখলেই মনে করে বিবাহ আসন্ন, তাই নিজের আর্জি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখে।

—এদের আক্কেল কিছুমাত্র নেই। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে—

—অমন ভুল বোঝা ওদের উচিত হয় নি, তাই না? কি জানেন, এরা হচ্ছে ব্যবসাদার, সুরূপ কুরূপ গ্রাহ্য করে না, শুধু লাভ-লোকসান বোঝে। আপনি যে মস্ত ধনী লোক তা এরা জানে না। ভেবেছে,

আমার মায়ের বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তিও আছে, আমি একমাত্র সন্তান, রোজগারও করি, অতএব বিশ্রী হলেও আমি সুপাত্রী।

—এরা অতি অসভ্য, এদের ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার।

—আপনি শম্পাকে নিয়ে ওদের দোকানে গেলেই ভুল ভাঙবে।

পরদিন সকালে শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে কাঞ্চন বলল, আমার এক জোড়া সক্‌স দরকার।

শম্পা বলল, চলুন কহেলিরামের দোকানে।

কহেলিরাম সসম্ভ্রমে বলল, নমস্তে বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। মোজা চাহি? নাইলন, সিল্ক, পশমী, সুতী—

কাঞ্চন বলল, দশ ইঞ্চ গ্রে উল্‌ন একজোড়া দাও।

মোজা দিয়ে কহেলিরাম বলল, যা দরকার হবে সব এখানে পাবেন হুজুর। হাওআই বুশশার্ট আছে, লিবার্টি আছে, ট্রাউজার ভি আছে। জর্জেট ভয়েল নাইলন শাড়ি আছে, বনারসী ভি আমি রাখি, ভেলভেট সাটিন কিংখাব ভি। ভাল ভাল বিলাতী এসেন্স ভি রাখি। দেখবেন হুজুর?

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন সহাস্যে বলল, বর-কনের পোশাক সবই আছে, এরা একবারে স্থির করে ফেলেছে দেখছি।

বিকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে এক বাণ্ডিল বাতি কিনল। রামসেবক বলল, দিদিমণি, একঠো ছোকরা চাকর রাখবেন? খুব কাজের লোক, আপনার বাজার করবে, চা বানাবে, বিছানা করবে, বাবুসাহেবের জুতি ভি বুরুশ করবে। দরমাহা বহুত কম, দশ টাকা দিবেন। আমি ওর জামিন থাকব। এ মুন্নালাল, ইধর আ।

তমিস্রার একটা চাকরের দরকার ছিল, মুন্নালালকে পেয়ে খুশী হল। বয়স আন্দাজ ষোল, খুব চালাক আর কাজের লোক।

রাত্রে কাঞ্চন তার ডায়ারিতে লিখল, শম্পা, তোমার কি উচ্চাশা নেই, নিজের ভাল মন্দ বোঝবার শক্তি নেই? আমাকে তো কদিন ধরে দেখলে, কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন? তমিস্রা তো আমাকে খুশী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হক, আর দুদিন দেখে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব।

তিন দিন পরে বিকালে তমিস্রা চায়ের ট্রে আনল দেখে কাঞ্চন বলল, আপনি আনলেন কেন, মুন্নালাল কোথায়?

তমিস্রা সহাস্যে বলল, সে শম্পার বাড়ি বদলী হয়েছে।

—আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন?

—আমি নয়, তার আসল মনিব রামসেবক পাঁড়ে, সেই মুন্নাকে ট্রান্সফার করেছে, এখানে তাকে রেখে আর লাভ নেই।

—কিছুই বুঝলুম না।

—আপনি একবারে চক্ষুকর্ণহীন। শম্পা, আমি, আর আপনি—এই তিনজনকে নিয়ে গণেশমুণ্ডার বাজারে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে তার কোনও খবরই রাখেন না। শুনুন।—মুন্নালাল হচ্ছে রামসেবকের স্পাই, গুপ্তচর। ওর ডিউটি ছিল আপনার আর আমার প্রেম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার দৈনিক রিপোর্ট দেওয়া। যখন সে জানাল যে কুছ ভি নহি, নথিং ডুইং, তখন তার মনিব তাকে শম্পার বাড়ি পাঠাল, শম্পা আর আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

—কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি?

—আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট, শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রামসেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম কদিন আমারই দর বেশী ছিল, থ্রী-টু-ওআন কৌআ-দিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলছে, ফাইভ-টু-ওআন সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দরই নেই।

—উঃ, এখানকার লোকরা একবারে হার্টলেস, মানুষের হৃদয় নিয়ে জুয়া খেলে! নাঃ, চটপট এর প্রতিকার করা দরকার।

—সে তো আপনারই হাতে, কালই শম্পার কাছে আপনার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করুন আর তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

পরদিন সকাল বেলা শম্পা বলল, আজ আর বেড়াতে পারব না, শুধু কহেলিরামের দোকানে একবার যাব।

কাঞ্চন বলল, বেশ তো, চলুন না, সেখানেই যাওয়া যাক।

শম্পার ওপর কহেলিরাম অনেক টাকার বাজি ধরেছিল। দুজনকে দেখে মহা সমাদরে বলল, আসেন আসেন বাবুসাহেব, আসেন সেন মিসিবাবা। হুকুম করুন কি দিব।

শম্পা বলল, একটা তাঞ্জোর শাড়ি চাই, কিন্তু দাম বেশী হলে চলবে না, কুড়ি টাকার মধ্যে।

—আরে দামের কথা ছোড়িয়ে দেন, আপনার কাছে আবার দাম! এই দেখুন, অচ্ছা জরিপাড়, পঁয়ত্রিশ টাকা। আর এই দেখুন, নয়া আমদানি চিদম্বরম সিল্ক শাড়ি, আসমানী রঙ, নকশাদার জরিপাড়, চওড়া আঁচলা, বহুত উমদা। এর অসলী দাম তো দো শও রুপেয়া, লেকিন আপনার কাছে দেড় শও লিব।

শম্পা মাথা নেড়ে বলল, কোনওটাই চলবে না, অত টাকা খরচ করতে পারব না। থাক, এখন শাড়ি চাই না, আসছে মাসে দেখা যাবে।

কাঞ্চন বলল, এই চিদম্বরম শাড়িটা কেমন মনে করেন?

শম্পা বলল, ভালই, তবে দাম বেশী বলেছে।

—আচ্ছা, আপনি যখন কিনলেন না তখন আমিই নিই।

কহেলিরাম দন্তবিকাশ করে শাড়িটা সযত্নে প্যাক করে দিল।

শম্পা বলল, কাকেও উপহার দেবেন বুঝি? তা কলকাতায় কিনলেন না কেন?

শম্পার বাসায় এসে কাঞ্চন বলল, শম্পা, এই শাড়িটা তোমার জন্যেই কিনেছি, তুমি পরলে আমি কৃতার্থ হব।

ভ্রূ কুঁচকে শম্পা বলল, আপনার দেওয়া শাড়ি আমি নেব কেন, আপনার সঙ্গে তো কোনও আত্মীয় সম্পর্ক নেই।

—শম্পা, তুমি মত দিলেই চূড়ান্ত সম্পর্ক হবে, আমার সর্বস্ব নেবার অধিকার তুমি পাবে। বল, আমাকে বিবাহ করবে? আমি ফেলনা পাত্র নই, আমার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, বাড়ি গাড়ি টাকাও আছে। তোমাকে সুখে রাখতে পারব।

—থামুন, ওসব কথা বলবেন না।

—কেন, অন্যায় তো কিছু বলছি না। আমার প্রস্তাবটা বেশ করে ভেবে উত্তর দাও।

—ভাববার কিছু নই, উত্তর যা দেবার দিয়েছি। ক্ষমা করবেন, আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারব না।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলল, একবারে সরাসরি প্রত্যাখ্যান? মিস সেন, আপনি ঠকলেন, কি হারালেন তা এর পর বুঝতে পারবেন।

সমস্ত পথ আপন মনে গজ গজ করতে করতে কাঞ্চন ফিরে এল। ডায়ারিতে লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার সোনালী শার্পার কলম থেকে এক লাইনও বেরুল না। সমস্ত দুপুর সে অস্থির হয়ে ভাবতে লাগল।

বিকাল বেলা তমিস্রা তার কর্মস্থান থেকে ফিরে এসে কাঞ্চনকে

দেখে বলল, একি মিস্টার মজুমদার, চুল উষ্ক খুষ্ক, চোখ লাল, মুখ শুখনো, অসুখ করেছে নাকি?

কাঞ্চন বলল, না, অসুখ করে নি। তমিস্রা, এই শাড়িটা তুমি নাও, আর বল যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ।

তমিস্রা খিল খিল করে হাসল, যেন শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দিল। তার পর বলল, এই ফিকে নীল শাড়িটা নিশ্চয় আমার জন্যে কেনেন নি, শম্পাকে দিতে গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমাকে দিচ্ছেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন, রাগের মাথায় বোকামি করবেন না।

—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে, বন্ধুদের কি বলব? তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে না হয় রাজী হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কত দিন দাঁড়কাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ছাড়া কি মেয়ে নেই? যা বলছি শুনুন।—কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আপনি হিসেবী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। বেশী যাচাই করবেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে হলেই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।

গনৎকার

লোকটির নাম হয়তো আপনাদের মনে আছে। কয়েক বৎসর আগে খবরের কাগজে তাঁর বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হত—ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি, জগদ্বিখ্যাত গ্রীক অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিশারদ, ললাটলিপিপাঠক, গ্রহরত্ন-বিধায়ক, হিপনটিস্ট, টেলিপ্যাথিস্ট, ক্লেয়ারভয়াণ্ট ইত্যাদি। ইনি ইজিপ্টে বহু দিন গবেষণা করে হার্মেটিক গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, দামস্কসে কালডীয় জ্যোতিষের রহস্য ভেদ করেছেন, কামরূপ-কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্র শিখেছেন, কাশীতে ভৃগুসংহিতার হাড়হদ্দ জেনে নিয়েছেন। কিছুই জানতে এঁর বাকী নেই।

আমার ভাগনে বঙ্কার মুখে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলুম।—ওঃ, এমন মহাপুরুষ দেখা যায় না, কলকাতার সমস্ত রাজজ্যোতিষীর অন্ন মেরে দিয়েছেন। বড় বড় ব্যারিস্টার উকিল ডাক্তার মন্ত্রী দেশনেতা প্রফেসর সাহিত্যিক সবাই দলে দলে তাঁর কাছে যাচ্ছেন আর থ হয়ে ফিরে আসছেন। মামা, তোমার তো সময়টা ভাল যাচ্ছে না, একবার এই গ্রীক গনৎকার ডক্টর মিনাণ্ডারের কাছে যাও না। ফী মোটে কুড়ি টাকা। আট নম্বর পিটারকিন লেন, দেখা করবার সময় সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেলে তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

গনৎকারের কাছে যাবার কিছুমাত্র আগ্রহ আমার ছিল না। একদিন কাগজে মিনাণ্ডার দ মাইটির ছবি দেখলুম। মাথায় মুকুটের মতন টুপি, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দু ইঞ্চি ঝোলা গোঁফ, ছ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গায়ে একটা নকশাদার উত্তরীয়, সেকালের গ্রীকদের মতন ডান হাতের

নীচ দিয়ে কাঁধের উপরে পড়েছে। গলায় কোমর পর্যন্ত ঝোলা রাশীচক্র মার্কা হার। মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হল। টুপি আর গোঁফদাড়ি চাপা দিয়ে খুব ঠাউরে দেখলুম। আরে! এ যে আমাদের ওল্ড ফ্রেণ্ড মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনাণ্ডার দ মাইটি হয়েছে। তিন বছর আগেও আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত, তার কিছু উপকারও আমি করেছিলুম। কিন্তু তার পরেই সে গা ঢাকা দিল। আমাকে এড়িয়ে চলত, চিঠি লিখলে উত্তর দিত না। স্থির করলুম, এনগেজমেণ্ট না করেই দেখা করব।

ভাগ্যজিজ্ঞাসুদের ভিড় এড়াবার জন্যে আটটার দু-চার মিনিট আগেই গেলুম। চৌরঙ্গী রোড থেকে একটি গলি বেরিয়েছে পিটারকিন লেন। আট নম্বরের দরজায় একটি বড় নেমপ্লেট আঁটা—ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি, নীচে ইংরেজী বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লেখা আছে—সোজা দোতলায় চলে আসুন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। সামনের দরজায় নোটিস আছে—ওয়েলকম, ভিতরে এসে বসুন।

ঘরটিতে আলো কম। একটা টেবিলের চার দিকে কতকগুলো চেয়ার আছে, আর কেউ সেখানে নেই। পাশের ঘরের পর্দা ভেদ করে মৃদু কণ্ঠস্বর আসছে। বুঝলুম, আমার আগেই অন্য মক্কেল এসে গেছে। হঠাৎ দেওয়ালে একটা ফ্রেমের ভিতর আলোকিত অক্ষর ফুটে উঠল—ওয়েট প্লীজ, একটু পরেই আপনার পালা আসবে। টেবিলে গোটাকতক পুরনো সচিত্র মার্কিন পত্রিকা ছিল, তারই পাতা ওলটাতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে আরও দুজন এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। একজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, অন্য জনের পঁচিশ-ছাব্বিশ। প্রথম লোকটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, অনেকক্ষণ বসে আছেন নাকি মশাই?

উত্তর দিলুম, তা প্রায় দশ মিনিট হবে।

—তবেই সেরেছে, আমাকে হয়তো ঘণ্টা খানিক ওয়েট করতে হবে। এই রতন, তুই শুধু শুধু এখানে থেকে কি করবি, বাড়ি যা।

রতন বলল, কেন, আমি তো বাগড়া দিচ্ছি না গোষ্ঠ-দা। গনৎকার সায়েব তোমাকে কি বলে না জেনে আমি নড়ছি না।

গোষ্ঠ-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন তো মশাই রতনার আক্কেল। আমি এসেছি নিজের ভাগ্যি জানতে, তুই কি করতে থাকবি?

আমি বললুম, আপনার ভাগ্যফল উনিও জানতে চান। আপনার আত্মীয় তো?

—আত্মীয় না হাতি। এ শালা আমার জোঁক, কেবল চুষে খাবার মতলব।

রতন বলল, আগে থাকতে শালা শালা ব'লো না মাইরি। আগে বিজির সঙ্গে তোমার বে হয়ে যাক তার পর যত খুশি ব'লো।

—আরে গেল যা। বিজিকেই যে বে করব তার ঠিক কি? গুলুরাণীও তো নিন্দের সম্বন্ধ নয়। কি বলেন সার?

আমি বললুম, আপনাদের তর্কের বিষয়টা আমি তো কিছুই জানি না।

—তা হলে ব্যাপারটা খুলে বলি শুনুন। আমি হলুম শ্রীগোষ্ঠ-বিহারী সাঁতরা, শ্যামবাজারের মোড়ে সেই যে ইম্পিরিয়াল টি-শপ আছে তারই সোল প্রোপাইটার। তা আপনার আশীর্বাদে দোকানটি ভালই চলছে। এখন আমার বয়স হল গে ত্রিশ পেরিয়ে একত্রিশ, এখনও যদি সংসার ধর্ম না করি তবে কবে করব? বুড়ো বয়সে বে করে লাভ কি? কি বলেন আপনি, অ্যাঁ? এখন সমিস্যে হয়েছে পাত্রী নিয়ে, দুটি আমার হাতে আছে। এক নম্বর হল, নফর দাসের মেয়ে গুলুরানী, ভাল নাম গোলাপসুন্দরী। দেখতে তেমন সুবিধের নয়,

একটু কুঁদুলীও বটে। কিন্তু বাপের টাকা আছে, বিয়ে করলে কিছু পাওয়া যাবে। তার পর ধরুন, যদি কারবারটি বাড়াতে চাই তবে শ্বশুরের কাছ থেকে কোন্ না আরও হাজার খানিক টাকা বাগাতে পারব। দু নম্বর পাত্রী হচ্ছে বিজনবালা, ডাক নাম বিজি, এই রতন শালার বোন। বাপ নেই, শুধু বুড়ী মা আর এই ভাগাবণ্ড ভাইটা আছে, অবস্থা খারাপ, বরপণ নবডঙ্কা। কিন্তু মেয়েটা দেখতে অতি খাসা, নানা রকম রান্না জানে, এক পো মাংসের সঙ্গে দেদার মোচা এঁচড় ডুমুরের কিমা মিশিয়ে শ-খানিক এমন চপ বানাবে যে আপনি ধরতেই পারবেন না যে তার চোদ্দ আনা নিরিমিষ। বিজিকে বে করলে সে আমার সত্যিকার পার্টনার হবে। শ্বশুরের টাকা নাই বা পেলুম, আপনার আশীর্বাদে আমার পুঁজি নেহাত মন্দ নেই। ইচ্ছে আছে টি-শপটির বোম্বাই প্যাটার্ন নাম দেব, নিখিল ভারত বিশ্রান্তি গৃহ। চপ কাটলেট ডেভিল মামলেট এই সব তৈরি করব, খদ্দেরের অভাব হবে না মশাই। আমার খুব ঝোঁক বিজির ওপর, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তার মা আর বাউণ্ডুলে ভাইটা আমার ঘাড়ে পড়বে। বুড়ী শ্বাশুড়ীকে পুষতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই রতনা আমার কাঁধে চাপবে আর বোনের কাছ থেকে হরদম টাকা আদায় করবে তা আমি চাই না।

রতন বলল, আমি কথা দিচ্ছি তোমার কাঁধে চাপব না। আমার ভাবনা কি, ইলেকট্রিকের সব কাজ জানি, আর্মেচারের তার পর্যন্ত জড়াতে পারি। একটা ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারি না মনে কর?

—যোগাড় করতে পারিস তো করিস না কেন রে হতভাগা? এ পর্যন্ত অনেক কাজ তো পেয়েছিলি, একটাতেও লেগে থাকতে পারলি নি কেন? ওই কিরণ চক্কোত্তি তোর মাথা খেয়েছে, দিনরাত তার তরুণ অপেরা পার্টিতে আড্ডা দিস, হয়তো নেশা-ভাঙও করিস।

—মাইরি বলছি গোষ্ঠ-দা, খারাপ নেশা আমি করি না। মাঝে মাঝে একটু সিদ্ধির শরবত খাই বটে, কিন্তু খুব মাইল্ড।

আমি বললুম, গোষ্ঠবাবু, আপনার সমস্যাটি তো তেমন কঠিন নয়। যখন শ্রীমতী বিজনবালাকে মনে ধরেছে তখন তাঁকে বিয়ে করাই তো ভাল। একটু রিস্ক না হয় নিলেন।

—আপনি জানেন না মশাই, এই রতনা সোজা রিস্ক নয়। সেই জন্যেই তো এই সায়েব জ্যোতিষীর কাছে এসেছি, আমার ঠিকুজিটাও এনেছি। ইনি সব কথা শুনে আমার হাত দেখে আর আঁক কষে যার নাম বলবেন, বিজনবালা কি গোলাপসুন্দরী, তাকেই প্রজাপতির নির্বন্ধ মনে করে বে করব। কুড়ি টাকা লাগে লাগুক, একটা তো হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, এই রতন যদি কলকাতার বাইরে একটা ভাল কাজ পায়, তা হলে তো আপনার সুরাহা হতে পারে?

—সুরাহা নিশ্চয় হয়, আমি তা হলে নিশ্চিন্দি হয়ে বিজিকে বে করতে পারি। কিন্তু তেমন চাকরি ওকে দিচ্ছে কে?

—রতনবাবু, তোমার লাইসেন্স আছে?

রতন বলল, আছে বইকি, ভাল ভাল সার্টিফিকিটও আছে। দয়া করে একটি কাজ যোগাড় করে দিন না সার, গোষ্ঠ-দার গঞ্জনা আর সইতে পারি না।

আমি বললুম, শোন রতন। একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে আমার যোগ আছে, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের জন্যে একজন ফিটার মিস্ত্রী দরকার। তোমাকে কাজটি দিতে পারি, প্রথমে এক শ টাকা মাইনে পাবে, তিন মাস প্রোবেশনের পর দেড় শ। কিন্তু শর্ত এই, একটি বৎসর শিলিগুড়ি থেকে নড়বে না, তবে বোনের বিয়ের সময় চার-পাঁচ দিন ছুটি পেতে পার। রাজী আছ?

—এক্ষুনি। দিন, পায়ের ধুলো দিন সার। অপেরা পার্টি ছেড়ে দেব, কিরণ চক্কোত্তির সঙ্গে আমার বনছে না, আজ পর্যন্ত আমাকে একটি টাকাও দেয় নি।

—তা হলে তুমি আজই বেলা তিনটের সময় আমাদের অফিসে গিয়ে দেখা ক'রো। ঠিকানাটা লিখে নাও।

ঠিকানা লিখে নিয়ে রতন বলল, গোষ্ঠ-দা, তোমার সমিস্যে তো মিটে গেল, মিছিমিছি গনৎকার সায়েবকে কুড়ি টাকা দেবে কেন। চল, বাড়ি ফেরা যাক।

গোষ্ঠ সাঁতরা বললেন, কোথাকার নিমকহারাম তুই! এই ভদ্রলোকের হাত দেখে জ্যোতিষী কি বলেন তা না জেনেই যাবি?

লজ্জায় জিব কেটে রতন নিজের কান মলল। এমন সময় জ্যোতিষীর খাস কামরার পর্দা ঠেলে দুজন গুজরাটী ভদ্রলোক হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, নিশ্চয় সুফল পেয়েছেন। এঁরা চলে গেলে জ্যোতিষীর কামরায় একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু পরে একজন মহিলা এলেন, কালো শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কাঁধে রাশিচক্র মার্কা লাল ব্যাজ। ইনি বোধ হয় ডক্টর মিনাণ্ডারের সেক্রেটারি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আগে এসেছেন?

উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হাঁ।

—আপনার নাম আর ঠিকানা? জন্মস্থান আর জন্মদিন?

সব বললুম, উনি নোট করে নিলেন।

—কুড়ি টাকা ফী দিতে হবে জানেন তো?

—জানি, টাকা সঙ্গে এনেছি।

—কি জানবার জন্যে এসেছেন?

—আসন্ন ভবিষ্যতে আমার অর্থপ্রাপ্তি-যোগ আছে কিনা।

—বুঝলুম না, সোজা বাঙলায় বলুন।

—জানতে চাই, ইমিডিয়েট ফিউচারে কিছু টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

সেক্রেটারি নোট করে নিলেন। তার পর গোষ্ঠ সাঁতরাকে বললেন, আপনার কি প্রশ্ন?

গোষ্ঠবাবু সহাস্যে বললেন, কিচ্ছু না, আমি আর রতন এই এনার সঙ্গে এসেছি।

তিন মিনিট পরেই সেক্রেটারি ফিরে এসে আমাকে বললেন, ডক্টর মিনাণ্ডার আপনাকে জানাচ্ছেন, এখন আপনার বরাতে টাকার ঘরে শূন্য। বছর খানিক পরে আর একবার আসতে পারেন।

গোষ্ঠবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, বা রে, এ কি রকম গোনা হল? আপনাকে না দেখেই ভাগ্যফল বললেন!

আমি বললুম, বুঝলেন না গোষ্ঠবাবু, এই মিনাণ্ডার সায়েবের দিব্যদৃষ্টি আছে, না দেখেই ভাগ্য বলে দিতে পারেন। চলুন, ফেরা যাক।

নেমে এসে গোষ্ঠবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি মশাই? জ্যোতিষী আপনার সঙ্গে দেখা করলেন না, ফীও নিলেন না, এ তো ভারি তাজ্জব!

বললুম, ব্যাপার অতি সোজা। এই জ্যোতিষীটি হচ্ছেন আমার পুরনো বন্ধু মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনাণ্ডার দ মাইটি হয়েছেন। তিন বছর আগে আমার কাছ থেকে কিছু মোটা রকম ধার নিয়েছিলেন, বার বার তাগিদ দিয়েও আদায় করতে পারি নি। অনেক দিন নিখোঁজ ছিলেন, এখন গ্রীক গনৎকার সেজে আসরে নেমেছেন। তাই আমার পাওনা টাকাটা সম্বন্ধে ওঁকে প্রশ্ন করেছিলুম।

রতন বলল, আপনি ভাববেন না সার, জোচ্চোরটাকে নির্ঘাত শায়েস্তা করে দেব। দয়া করে আমাকে তিনটি দিন ছুটি দিন, আমি

দলবল নিয়ে এর দরজার সামনে পিকেটিং করব, আর গরম গরম স্লোগান আওড়াব। বাছাধন টাকা শোধ না করে রেহাই পাবেন না।

রতনের পিকেটিংএ সুফল হয়েছিল। ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি আমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক দিয়ে জানালেন, পশার একটু বাড়লে বাকীটা শোধ করবেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি টিকতে পারলেন না, এখানকার পাট তুলে দিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে দিল্লি চলে গেলেন।

১৮৮১

সাড়ে সাত লাখ

হেমন্ত পাল চৌধুরীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে একজন পাকা ব্যবসাদার, পৈতৃক কাঠের কারবার ভাল করেই চালাচ্ছে। রাত প্রায় নটা, বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে হেমন্ত হিসাবের খাতাপত্র দেখছে। তার জ্ঞাতি-ভাই নীতীশ হঠাৎ ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। বড় ব্যস্ত নাকি?

হেমন্ত বলল, না, আমার কাজ কাল সকালে করলেও চলবে। ব্যাপার কি, এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছ কেন? তোমাদের তো এই সময় জোর তাসের আড্ডা বসে। কোনও মন্দ খবর নাকি?

নীতীশ বলল, ভাল কি মন্দ জানি না, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

নীতীশের কথার আগে তার সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্কটা জানা দরকার। এদের দুজনেরই প্রপিতামহ ছিলেন মদনমোহন পাল চৌধুরী, প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর দুই পুত্র অনঙ্গ আর কন্দর্প বৈমাত্র ভাই, বাপের মৃত্যুর পর বিষয় ভাগ করে পৃথক হন। অনঙ্গ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে কন্দর্পের কাছ থেকে বিস্তর টাকা ধার নিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক পুত্র বসন্তকে রেখে অনঙ্গ অকালে মারা যান। কন্দর্প তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আজীবন মকদ্দমা চালান। অবশেষে তিনি জয়ী হন এবং বসন্ত প্রায় সর্বস্বান্ত হন। পরে বসন্ত কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেই কারবারের খুব উন্নতি করেছে।

কন্দর্প আর তাঁর পুত্র যতীশও গত হয়েছেন। যতীশের পুত্র নীতীশ এখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। জমিদারি আর নেই, আগেকার ঐশ্বর্যও কমে গেছে, কিন্তু পৈতৃক সঞ্চয় যা আছে তা থেকে নীতীশের আয় ভালই হয়। রোজগারের জন্যে তাকে খাটতে হয় না, বদখেয়ালও তার নেই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর সাহিত্য সিনেমা ফুটবল ক্রিকেট রাজনীতি চর্চা করে সময় কাটায়। হেমন্ত তার সমবয়স্ক, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল। এদের বাপদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, কিন্তু হেমন্ত আর নীতীশের মধ্যে পৈতৃক মনোমালিন্য মোটেই নেই, অন্তরঙ্গতাও বেশী নেই।

মাথায় দু হাত দিয়ে নীতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, ভাই হেমন্ত, মহাপাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

হেমন্ত বলল, পাপটা কি শুনি। খুন না ডাকাতি না নারীহরণ? কি করেছ তুমি?

—আমি কিছুই করি নি, করেছেন আমার ঠাকুরদা।

—কন্দর্পমোহন পাল চৌধুরী? তিনি তো বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁর পাপের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বেয়াড়া ব্যাধি পেয়েছ নাকি?

—না, আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। আজ সকালে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলুম। জমিদারি তো গেছে, বাজে দলিল আর কাগজপত্র রেখে লাভ নেই, তাই জঞ্জাল সাফ করছিলুম। ঠাকুরদার আমলের একটা কাঠের বাক্সে হঠাৎ কতকগুলো পুরনো চিঠিপত্র আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। ওঃ, মহাপাপ মহাপাপ!

—ব্যাপারটা কি?

—আমার ঠাকুরদা কন্দর্প তোমার ঠাকুরদা অনঙ্গের নায়েব-

গোমস্তাদের ঘুষ দিয়ে কতকগুলো দলিল জাল করেছিলেন আর মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করেছিলেন। তারই ফলে তোমার বাবা মকদ্দমায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—বল কি! না না, তা' হতে পারে না, নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল মোটেই হয় নি। আমার ভগিনীপতি ফণীবাবুকে জান তো? মস্ত উকিল। তাঁকে সব কাগজপত্র দেখিয়েছি। তিনিও বলেছেন, আমার ঠাকুরদার জাল-জোচ্চুরির ফলেই তোমার বাবা বসন্ত পাল চৌধুরী সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—তা এখন করতে চাও কি? ফণীবাবু কি বলেন?

—বললেন, চুপ মেরে যাও। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, পুরনো কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

—তাই বুঝি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে জানাতে এসেছ? ফণীবাবু বিচক্ষণ ঝানু লোক, পাকা কথা বলেছেন, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আর, ও তো তামাদি হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে নীতীশ বলল, কি যা তা বলছ, পাপ কখনও তামাদি হয় না। আমার ঠাকুরদা জোচ্চুরি করে যা আদায় করেছেন তা আমি ভোগ করতে চাই না। খতিয়ে দেখেছি, সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা তোমার পাওনা। সে টাকা তোমাকে না দিলে আমার স্বস্তি নেই।

—ওই টাকা দিলে তোমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে?

—খুব মন্দ হবে। কষ্টে সংসার চলবে, রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা এসব জানতেন?

—বোধ হয় না। তিনি নিজে জমিদারি দেখতেন না, নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েব নতুন লোক, তারও কিছু জানবার কথা নয়।

—তোমার বউকে জানিয়েছ?

—না। জানলে কান্নাকাটি করবে, শ্বশুর মশাইকে বলে মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আগে তোমার পাওনা শোধ করব তার পর জানাব।

—বাহবা! দেখ নীতীশ, ভাগ্যক্রমে আমি নিঃস্ব নই, রোজগার ভালই করি, বেশী বড়লোক হবার লোভও নেই। ফাঁকতালে তুমি যা পেয়ে গেছ তা তোমারই থাকুক, নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ কর। আমি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বলছি, ওই টাকার ওপর আমার কিছুমাত্র দাবি নেই। চাও তো একটা না-দাবি পত্র লিখে দিতে পারি। আরও শোন—সাড়ে সাত লাখ টাকা না পেলেও আমার পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে চলবে, কিন্তু ওই টাকার অভাবে তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ের অবস্থা কি রকম হবে তা ভেবেছ? তুমি না হয় একজন প্রচণ্ড সাধুপুরুষ, সাক্ষাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিছুই গ্রাহ্য কর না, কিন্তু তোমার স্ত্রী আর সন্তানরা যে রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কষ্ট দেবে কেন? তোমার ঠাকুরদার কুকর্ম আমাকে জানিয়েছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তোমারও দায়িত্ব খণ্ডে গেছে। আর কিছু করবার দরকার নেই।

সজোরে মাথা নেড়ে নীতীশ বলল, ওই পাপের টাকা ভোগ করলে আমি মরে যাব। যা তোমার হক পাওনা তা নেবে না কেন?

একটু ভেবে হেমন্ত বলল, শোন নীতীশ, আজ তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছ, তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল সন্ধ্যের সময় এখানে এসো, দুজনে পরামর্শ করে একটা মীমাংসা করা যাবে, যাতে তোমার মনে

শান্তি আসে। তোমার ভগিনীপতি ফণীবাবুর সঙ্গেও আর একবার পরামর্শ ক'রো।

পরদিন সন্ধ্যায় নীতীশ আবার এল। হেমন্ত প্রশ্ন করল, ফণীবাবুকে তোমার মতলব জানিয়েছ?

—হুঁ। তিনি রফা করতে বললেন।

—রফা কি রকম?

—বিবেকের সঙ্গে রফা। বললেন, ওহে নীতীশ, তুমি আর হেমন্ত দুজনেই সমান বোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। টাকাটা আধাআধি ভাগ করে নাও, তা হলে দুজনেরই কনশেন্স ঠাণ্ডা হবে।

—হেমন্ত হেসে বলল, চমৎকার। তুমি কি বল নীতীশ?

—ড্যাম ননসেন্স। চুরির টাকা চোররা ভাগ করে নেয়, কিন্তু তুমি আর আমি চোর নই। পরের ধনের এক কড়াও আমি নিতে পারি না। তোমার যা হক পাওনা তা পুরোপুরি তোমাকে নিতে হবে।

—আমার হক পাওনা কি করে হল? জমিদারি পত্তন করেন তোমার-আমার প্রপিতামহ মহামহিম দোর্দণ্ডপ্রতাপ মদনমোহন পাল চৌধুরী। তিনি রামচন্দ্র বা বুদ্ধদেব ছিলেন না। সেকালে অনেক দুর্দান্ত লোক যেমন করে জমিদারি পত্তন করত তিনিও তেমনি করেছিলেন। ডাকাতি লাঠিবাজি জালিয়াতি জোচ্চুরি ঘুষ—এই ছিল তাঁর অস্ত্র। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে?

—ওই রকম শুনেছি বটে।

—তা হলে বুঝতে পারছ, ওই জমিদারিতে কারও ধর্মসংগত অধিকার থাকতে পারে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আমার হাতছাড়া হয়েছে তা ভালই হয়েছে।

—কিন্তু আমার তো হাতছাড়া হয় নি, প্রপিতামহ আর পিতামহ দুজনেরই পাপের ধন সবটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তুমি যদি নিতান্তই না নিতে চাও তবে মদনমোহন যাদের বঞ্চিত করেছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে।

—তাদের খুঁজে পাবে কোথায়, সে তো এক-শ সওয়া-শ বছর আগেকার ব্যাপার। তুমি সম্পত্তি দান করবে এই কথা রটে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোচ্চোর এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে।

—তবে জনহিতার্থে টাকাটা দান করা যাক। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা।

—দেখ হেমন্ত, ওই টাকাটা সদুদ্দেশ্যে খরচ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আমি এ কাজে পটু নই।

—রক্ষে কর। আমি নিজের ব্যবসা নিয়েই অস্থির, তোমার দান-সত্রের বোঝা নেবার সময় নেই। আর একটা কথা। সদুদ্দেশ্যে দান, শুনতে বেশ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? মন্দির মঠ সেবাশ্রম হাসপাতাল আতুরাশ্রম ইস্কুল-কলেজ, না আর কিছু?

—তা জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। আমাদের সঙ্গে ফেলু মহান্তি পড়ত মনে আছে? তার শালা ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী সম্প্রতি ইওরোপ আমেরিকা ফার-ঈস্ট টুর করে এসেছেন। শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্লেটো কৌটিল্য থেকে শুরু করে বেন্থাম মিল মার্ক্স লেনিন সবাইকে গুলে খেয়েছেন। চীন সরকার নাকি কনসল্টেশনের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি রাজী হও তবে ডক্টর প্রেমসিন্ধুর মত নেওয়া যাবে, তোমার টাকার সার্থক খরচ কিসে হবে তা তিনিই বাতলে দেবেন।

—বেশ তো। তাঁর সঙ্গে চটপট এনগেজমেণ্ট করে ফেল।

পরদিন বিকালবেলা হেমন্ত আর নীতীশ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারীর বাড়ি উপস্থিত হল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবুর সংকল্প খুবই ভাল, কিন্তু সাড়ে সাত লাখ টাকা কিছুই নয়, তাতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।

হেমন্ত বলল, যতটুকু হতে পারে তারই ব্যবস্থা দিন।

একটু চিন্তা করে ডক্টর খাণ্ডারী বললেন, সর্বাধিক লোকের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাই দেখতে হবে, কিন্তু অযোগ্য লোকের জন্যে এক পয়সা খরচ করা চলবে না। সমাজের ক্ষণস্থায়ী উপকার করাও বৃথা, এমন কাজে টাকাটা লাগাতে হবে যাতে চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়। আচ্ছা নীতীশবাবু, আপনার ইচ্ছেটা আগে শুনি, কি রকম সৎকার্য আপনার পছন্দ?

একটু ইতস্তত করে নীতীশ বলল, আমার মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর নামে টাকাটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর মঠে দিলে কেমন হয়? ধর্মের প্রচার হলে লোকচরিত্রের উন্নতি হবে, তাতে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

প্রেমসিন্ধু হেসে বললেন, অত্যন্ত সেকেলে আইডিয়া। টাকাটা পেলে সাধু মহারাজদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, তাঁরা লুচি মণ্ডা দই ক্ষীর খেয়ে পুষ্টিলাভ করবেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কিছুই হবে না। তা ছাড়া আপনার মায়ের নামে টাকা দিলে তো নিঃস্বার্থ দান হবে না, টাকার বদলে আপনি চাচ্ছেন মায়ের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।

লজ্জিত হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা মায়ের নামে না-ই দিলাম। যদি কোনও ভাল সেবাশ্রমে—

—সব ভাল সেবাশ্রমেরই প্রচুর অর্থবল আছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে কি হবে? আর, আপনার সাড়ে সাত লাখ তো ছিটে-ফোঁটা মাত্র।

—যদি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে দেওয়া যায়?

—খেপেছেন! উদ্বাস্তুদের হাতে পেঁছুবার আগেই বাস্তু-ঘুঘুরা টাকাটা খেয়ে ফেলবে। কাগজে যে সব কেলেঙ্কারি ছাপা হয় তা পড়েন না?

—একটা কলেজ বা গোটাকতক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়?

—ভস্মে ঘি ঢাললে যা হয়। স্কুল কলেজে কি রকম শিক্ষা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। আপনার টাকায় তার চাইতে ভাল কিছু হবে না, শুধু নতুন একদল হল্লাবাজ ধর্মঘটী ছোকরার সৃষ্টি হবে।

—তবে না হয় সরকারের হাতেই টাকাটা দেওয়া যাক। তাঁরাই কোনও লোকহিতকর কাজে খরচ করবেন।

অট্টহাস্য করে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবু, আপনি এখনও বালক। হয়তো মনে করেন সরকার হচ্ছেন একজন অগাধবুদ্ধি সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক পুরুষোত্তম। তা নয় মশাই, সরকার মানে পাঁচ ভূতের ব্যাপার। কোটি কোটি টাকা যেখানে খরচ হয় সেখানে আপনার সাড়ে সাত লাখ তো সমুদ্রে জলবিন্দুর মতন ভ্যানিশ করবে।

হেমন্ত বলল, আচ্ছা আমি একটা নিবেদন করি। শুনতে পাই ভগবান এখন মন্দির ত্যাগ করে ল্যাবরেটরিতে অধিষ্ঠান করছেন, সেখানেই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু হয়েছেন। কৃষি আর খাদ্যের রিসার্চের জন্যে কোনও ইন্‌স্টিটিউটে টাকাটা দিলে কেমন হয়?

—হেমন্তবাবু, সে রকম ইন্‌স্টিটিউট দেশে অনেক আছে। বলতে পারেন, ঢাক পেটানো ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র কাজ হয়েছে?

হতাশ হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, টাকাটা যদি কোনও আতুরাশ্রমে দেওয়া যায়? অন্ধ বোবা-কালা পঙ্গু উন্মাদ অসাধ্য-রোগগ্রস্ত—এদের সেবার জন্যে?

ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, শুনুন নীতীশবাবু, আপনার মতন নরম মন অনেকেরই আছে, কিন্তু তা একটা মহা ভ্রান্তির ফল। যদি শক্‌ড না হন তবে খোলসা করে বলি।

নীতীশ আর হেমন্ত একসঙ্গে বলল, না না, শক্‌ড হব না, খোলসা করেই বলুন।

—নীতীশবাবু যে সব আতুরজনের কথা বললেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখলে সমাজের কি লাভ? ধরুন আপনি বেগুন কি ঢ্যাঁড়সের খেত করেছেন। পোকাধরা অপুষ্ট গাছগুলোকেও কি বাঁচিয়ে রাখবেন? নিশ্চয়ই নয়, তাদের উপড়ে ফেলে দেবেন, নয়তো ভাল গাছগুলোর ক্ষতি হবে। পঙ্গু আতুর জনও সেই রকম, তারা সমাজের কোনও কাজে আসে না, শুধু গলগ্রহ। যদি স্বহস্তে উৎপাটন করতে না চান তবে অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না, চটপট মরতে দিন। দেখুন, আমাদের দেশে নানা রকম অভাব আছে, খাদ্য বস্ত্র আবাস বিদ্যা চিকিৎসা, আরও কত কি। সমাজের যারা যোগ্যতম, অর্থাৎ সুস্থ প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান কাজের লোক, শুধু তাদেরই যাতে মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করুন, যারা আতুর অক্ষম জড়বুদ্ধি আর স্থবির তাদের সেবার জন্যে টাকার অপব্যয় করবেন না। জানেন বোধ হয়, ২৫।৩০ বৎসর পরে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটির স্থানে ৮০ কোটি হবে। এত লোক পুষবেন কি করে? যতই কৃষিবৃদ্ধি আর জন্মশাসনের চেষ্টা করুন, বিশেষ কিছু ফল হবে না, আশি কোটি অধিবাসীর ঠেলা কিছুতেই সামলাতে পারবেন না।

—আপনি কি করতে বলেন?

—আমি যা চাই তা শুনলে নেহেরুজীর মতন র‍্যাশনাল লোকও

কানে আঙুল দেবেন। আমি বলি—লীভ ইট টু নেচার। কিছু-কালের জন্যে সব হাসপাতাল বন্ধ রাখতে হবে, ডাক্তারদের ইনটার্ন করতে হবে, পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি আধুনিক ওষুধ নিষিদ্ধ করতে হবে, ডিডিটি আর সারের কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। কলেরা বসন্ত প্লেগ যক্ষ্মা দুর্ভিক্ষ বার্ধক্য ইত্যাদি হল প্রকৃতির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ, এদের অবাধে কাজ করতে দিন, তাতে অনেকটা ভূভার হরণ হবে। শায়েস্তা খাঁর আমলে দু আনায় এক মন চাল পাওয়া যেত। তার কারণ এ নয় যে তিনি ধানের চাষ বাড়িয়েছিলেন কিংবা কালোবাজারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লড়েন নি, ফ্রী হ্যান্ড দিয়েছিলেন। আর আমাদের এখনকার দয়াময় দেশনেতাদের দেখুন, বলেন কিনা প্রাণদণ্ড তুলে দাও! আমার মতে শুধু খুনী আসামী নয়, চোর ডাকাত জালিয়াত ঘুষখোর ভেজাল-ওয়ালা কালোবাজারী দাঙ্গাবাজ ধর্ষক রাষ্ট্রদ্রোহী—সবাইকে সরাসরি ফাঁসি দেওয়া উচিত। তাতে যতটুকু লোকক্ষয় হয় ততটুকুই লাভ। আতুরাশ্রম সেবাশ্রম হাসপাতাল আর হেল্‌থ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সর্বনাশ হবে। প্রকৃতিকে বাধা দেবেন না মশাই, কাজ করতে দিন। তার পর দেশের বাড়তি জঞ্জাল যখন দূর হবে, লোকসংখ্যা যখন চল্লিশ কোটি থেকে নেমে দশ কোটিতে দাঁড়াবে, তখন জনহিত কর্মে কোমর বেঁধে লাগবেন।

হেমন্ত বলল, তা হলে নীতীশের টাকাটার কোনও সদ্‌গতি হবে না?

—কেন হবে না, অবশ্যই হবে। ওই টাকায় প্রোপাগাণ্ডা করে লোকমত তৈরি করতে হবে, সুরেন বাঁড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এজিটেশন এজিটেশন অ্যান্ড এজিটেশন। আমার একটা থিসিস লেখা আছে, তার লক্ষ কপি ছাপিয়ে লোকসভা রাজ্যসভা আর বিধানসভার সদস্যদের

মধ্যে বিলি করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' বলেছেন তা ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। দেশের ওআর্থলেস রুগ্ন অথর্ব অক্ষম লোকদের উচ্ছেদ করে শুধু বলবান বুদ্ধিমান কাজের লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুনুন নীতীশবাবু হেমন্তবাবু, আগে আমাদের দেশনেতাদের নির্মম বজ্রাদপি কঠোর হওয়া দরকার, তার পর জমি তৈরী হলে মনের সাধে লোকহিত করবেন।

হাততালি দিয়ে হেমন্ত বলল, চমৎকার। গীতার 'শ্রীভগবানুবাচ' আর Nietzscheর Thus spake Zarathustraর চাইতে ঢের ভাল বলেছেন। বহু ধন্যবাদ ডক্টর খাণ্ডারী, আপনার বাণী আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখব। এই কুড়ি টাকা দয়া করে নিন, যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। আচ্ছা আজ উঠি, নমস্কার।

ফেরার পথে নীতীশ বলল, লোকটা উন্মাদ না পিশাচ? হেমন্ত বলল, তেত্রিশ নয়ে পইসে উন্মাদ, তেত্রিশ পিশাচ আর চৌত্রিশ জবরদস্ত জনহিতৈষী। মনুস্মৃতি, মার্ক্‌সবাদ গান্ধীবাদ, সবই এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তাই ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী নতুন বাণী প্রচার করে যুগাবতার হবার মতলবে আছেন। তবে এঁর প্রলাপবাক্যের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও কিঞ্চিৎ আছে। শোন নীতীশ, তোমার দানসত্রের ভার পরের হাতে দিও না, তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, কেবলই মনে হবে ব্যাটা চুরি করছে। নিজের খুশিতে দান কর, সেবাশ্রমে আতুরাশ্রমে হাসপাতালে স্কুল-কলেজে, যেখানে তোমার মন চায়। যদি ভুলক্রমে অপাত্রে কিছু দিয়ে ফেল তাতেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু ফতুর হয়ে দান ক'রো না। নিজের সংসারযাত্রার জন্যেও কিছু রেখো। তোমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে

যদি কষ্টে পড়ে, তোমাকে যদি রোজগারের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে লোকসেবায় মন দিতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু টাকাটা তো আসলে তোমার, অতএব লোকসেবার ভার তুমিই নেবে, আমি তোমার সহকারী হব।

—আঃ, তোমার খুঁতখুঁতুনি এখনও গেল না দেখছি। বেশ, টাকাটা না হয় আমারই। কিন্তু আমার ফুরসত কম, দানসত্রের ভার তোমাকেই নিতে হবে, তবে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছি। জান তো, ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সর্ব কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও, কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের বদলে আমাকেই অর্পণ ক'রো। পিতৃপুরুষদের দেনা শোধ করে তুমি তৃপ্তিলাভ করবে, স্বহস্তে দান করে ধন্য হবে। আর, তোমার দানের পুণ্যফল আমি ভোগ করব। ফণীবাবুর ব্যবস্থার চাইতে এই রকম ভাগাভাগি ভাল নয় কি?

১৮৮৯

যশোমতী

মেজর পুরঞ্জয় ভঞ্জ এম. ডি, আই. এম. এস অনেক কাল হল অবসর নিয়েছেন, রোগী দেখাও এখন ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে, কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে থাকতে পারেন না, বছরের মধ্যে আট-ন মাস বাইরে ঘুরে বেড়ান।

শীত কাল। পুরঞ্জয় দেরাদুনে এসেছেন, আট-দশ দিন এখানে থাকবেন। রাজপুর রোডে শিবালিক হোটেলে উঠেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর পুরনো চাকর বৃন্দাবন। রাত প্রায় আটটা, পুরঞ্জয় তাঁর ঘরে ইজি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। বৃন্দাবন এসে জানাল, এক বুড়ী গিন্নী-মা দেখা করতে চান। পুরঞ্জয় বললেন, আসতে বল তাঁকে।

যিনি এলেন তিনি খুব ফরসা, একটু মোটা, গাল আর থুতনিতে বলি পড়েছে। মাথায় প্রচুর চুল, কিন্তু প্রায় সবই পেকে গেছে। পরনে সাদা গরদ, সাদা ফ্লানেলের জামা, তার উপর সাদা আলোয়ান। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে পুরঞ্জয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? চিনতে পারছি না তো।

আগন্তুকা বললেন, আমি যশো, আলীপুরের যশোমতী।

—সেকি! তুমি যশো, যশোমতী গাঙ্গুলী, কি আশ্চর্য!

—গাঙ্গুলী আগে ছিলুম, এখন মুখুজ্যে।

—ও, তোমার স্বামী মুখুজ্যে। তোমাকে দেখে চমকে গেছি,

পঞ্চান্ন বছর পরে আবার দেখা হল, চিনব কি করে? তোমার এক মাথা কালো চুল ছিল, সাদা হয়ে গেছে। ছিপছিপে গড়ন ছিল, এখন মোটা হয়ে পড়েছ। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে, গাল কুঁচকে গেছে। তুমি অতি সুন্দরী তন্বী কিশোরী ছিলে, হাসলে গালে টোল পড়ত, দাঁত ঝিকমিক করে উঠত।

যশোমতী ম্লান মুখে হাসলেন।

—ওই ওই! এখনও গালে টোল পড়েছে, দাঁত ঝিকমিক করেছে।

—বাঁধানো দাঁত।

—তা হক, আগের মতনই সুন্দর ঝিকমিকে। আমাদের শারীর শাস্ত্রে বলে, দাঁত নখ চুল আর শিঙ জীবন্ত অঙ্গ নয়, এদের সাড় নেই। আসল আর নকলে প্রায় সমানই কাজ চলে।

—সব কাজ চলে না। ছোলা ভাজা চিবুতে পারি না।

—ভাল ডেণ্টিস্টকে দিয়ে বাঁধালে পারবে। যশো, তুমি এখনও কোকিলকণ্ঠী, তবে গলার স্বর একটু মোটা হয়েছে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ?

—তা না পারব কেন। তোমার চুল পেকেছে, টাক পড়েছে, কিন্তু মুখের ছাঁদ বদলায় নি, গালও বেশী তোবড়ায় নি, গলার স্বরও আগের মতন আছে।

—দেরাদুনে কবে এলে? আমার সন্ধান পেলে কি করে?

—পরশু এখানে পৌঁছেছি। আমার নাতি ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার হয়ে এসেছে, তার কাছেই আছি। আজ সকালে এই হোটেলে দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। অতিথিদের লিস্টে তোমার নাম দেখলুম।

—নাতিকে নিয়ে এলে না কেন?

—আজ এত কাল পরে তোমার সন্ধান পেলুম, তাই একাই দেখা

করতে ইচ্ছে হল। নাতি নাতবউকে কাল দেখো। এখন তোমার পরিবারের কথা বল। সঙ্গে আন নি?

—পরিবার কোথা, বিয়েই করি নি। অবাক হলে কেন, অবিবাহিত বুড়ো তো কত শত আছে। তোমার খবর বল। স্বামী আর শ্বশুরবাড়ি ভাল পেয়েছিলে তো?

মাথা নত করে যশোমতী বললেন, স্বামী শুধু সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম এই অপরাধে শ্বশুর-বাড়ির সকলে আমাকে কলঙ্কিনী মনে করতেন। আমি বাবার এক-মাত্র সন্তান, ভবিষ্যতে তাঁর সম্পত্তি পাব, শুধু এই কারণেই তাঁরা আমাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। বিয়ের দু বছর পরেই স্বামী মারা যান। একটি ছেলে ছিল, আমার সব দুঃখ দূর করেছিল, সেও জোয়ান বয়সে চলে গেল। পুত্রবধূও প্রসবের পরে মারা গেল। এখন একমাত্র সম্বল নাতি ধ্রুব, আর তার বউ রাকা।

—উঃ, অনেক শোক পেয়েছ। ললাটের লিখন আমি মানি না, তবু কি মনে হচ্ছে জান? তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তোমার বাপ মা মনে করতেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হবে। তাঁরা যদি গোঁড়া না হতেন, আমাদের বিয়েতে যদি মত দিতেন, তবে তুমি এখনও সধবা থাকতে, দু-চারটে ছেলেমেয়েও হয়তো বেঁচে থাকত। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।

—মনে করব কেন। ছোট বেলায় তুমি রেখে ঢেকে কথা বলতে না, এখনও দেখছি তোমার মনের আর মুখের তফাত নেই। তুমি কেন বিয়ে কর নি তা বল।

—করি নি তার কারণ, তোমাকে প্রচণ্ড ভালবেসেছিলুম, সহজে ভুলতে পারি নি। আমার বিয়ে দেবার জন্যে বাপ-মা অনেক চেষ্টা

করেছিলেন, কিন্তু আমার মন তোমাকেই আঁকড়ে ছিল। তোমার বিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে হল তখন অত্যন্ত ঘা খেয়েছিলুম, দেহ মন প্রাণ যেন কেউ পিষে ফেলেছিল। পরে অবশ্য একটু একটু করে সামলে উঠেছিলুম, তোমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে আর হয় নি।

—কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলা মেশা কর নি?

—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। আমি শুকদেব বা রামকৃষ্ণ পরমহংস নই, পতন হয়েছিল, কিন্তু অল্প কালের জন্যে। একদিন স্বপ্ন দেখলুম, তোমার মৃতদেহ যেন আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলছি। আর্তনাদ করে জেগে উঠলুম, ধিক্‌কারে মন ভরে গেল। হিন্দুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সতীত্বের সংস্কার পায়, তাই তারা সহজেই শুচি থাকে। কিন্তু পুরুষরা কোনও শিক্ষা পায় না। মেয়েদের বলা হয় সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও।

—কি নিয়ে এত কাল কাটালে?

—চাকরি, রোগীর চিকিৎসা, অজস্র বই পড়া, আর ঘুরে বেড়ানো। তোমার স্মৃতি ক্রমশ মুছে গেলেও যেন মনে ছেঁকা দিয়ে স্টেরাইল করে দিয়েছিল, সেখানে আর কেউ স্থান পায় নি। ওকি, কাঁদছ নাকি? বড় বড় দুঃখের ভোগ তো তোমার চুকে গেছে, এখন আমার তুচ্ছ কথায় কাতর হচ্ছ কেন? শোন যশো, তোমাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়েছিল, আর আমি এখনও কুমার আছি, এর জন্যে নিজেকে ছোট ভেবো না। তোমার বয়স ছিল মোটে পনরো, এখনকার হিসেবে প্রায় খুকী। তুমি আমাকে খুব ভাল বাসতে তা ঠিক, কিন্তু বাল্য-কালের সে ভালবাসা হচ্ছে কাফ লভ, ছেলেমানুষী ব্যাপার, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না।

—তুমি কিছুই বোঝ না।

—কিছু কিছু বুঝি। তুমি ছিলে সেকেলে গোবেচারী শান্ত মেয়ে, বাপ-মা যখন বিয়ে দিলেন তখন আপত্তি জানাবার শক্তিই তোমার ছিল না, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না এ কথা মুখ ফুটে বলা তোমার অসাধ্য ছিল। আর আমি ছিলুম তোমার চাইতে পাঁচ বছরের বড়, প্রায় সাবালক, বাপ-মা আমাকে নিজের মতে চলতে দিতেন। তুমি ছিলে নিতান্তই পরাধীন, আর আমি ছিলুম প্রায় স্বাধীন। আইবুড়ো থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে ছিল না। যশো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, দোষ নিও না। মনে কর সেই পঞ্চান্ন বছর আগে তুমি যেন ছিলে একালের মেয়ে, বালিকা নয়, কিশোরী নয়, একুশ-বাইশ বছরের সাবালিকা। যদি আমি তোমাকে বলতুম, যশো, তোমার বাপ-মা নাই বা মত দিলেন, তাঁদের অমতেই আমাদের বিয়ে হক, তোমার ভার নেবার সামর্থ্য আমার আছে, তা হলে তুমি রাজী হতে?

—নিশ্চয় হতুম।

—যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন সেই বাপ-মার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে তাঁদের ত্যাগ করতে পারতে? যার সঙ্গে তোমার পরিচয় খুব বেশী নয়, যে তোমার আপন শ্রেণীর নয়, সেই আমাকেই বরণ করতে?

—নিশ্চয় করতুম।

—থ্যাংক ইউ যশো, তোমার উত্তর শুনে আমি ধন্য হয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একটা প্রাকৃতিক বিধান, কিন্তু তার সময় আছে, তখন বাপ মা ভাই বোনের চাইতে প্রেমাস্পদ বড় হয়ে ওঠে। তবে বিবাহের পর স্বামীরও প্রতিদ্বন্দ্বী আসে—সন্তান। কিশোর বয়সে তোমার যা অসাধ্য ছিল, সমাজের দৃষ্টিতে যা অন্যায়ও গণ্য হত,

যৌবনকালে বিনা দ্বিধায় তা তুমি পারতে, তোমার এই কথা শুনে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

—কি যে বল তার ঠিক নেই। পনরো বছরের সুশ্রী যশো যে-কথা বলতে পারে নি বলে তোমার মন ভেঙে গিয়েছিল, সেই কথা সত্তর বছরের বুড়ী বিশ্রী যশো তোমাকে আজ মুখ ফুটে বলতে পেরেছে এতে তোমার লাভটা কি হল, তুমি কৃতার্থই বা হবে কেন? যা ঘটেছিল তার বদলে যদি অন্য রকম ঘটত—এ রকম চিন্তা তো আকাশকুসুম রচনা, বুড়োবুড়ীর পক্ষে নিছক পাগলামি।

—পাগলামি নয়, মনের পটে ছবি আঁকা। যে অতীত কাল চলে গেছে তার ধ্বংস হয় নি, তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা যায়, তাতে নতুন করে রঙ দেওয়া চলে।

—যাক গে ওসব বাজে কথা। শোন, কাল তুমি আমার ওখানে খাবে। টপকেশ্বর রোড, জিম-কর্বেট লজ। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এসো। আসবে তো? নাতিকে পাঠাতে পারি, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—না না, পাঠাতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব, ওদিকটা আমার জানা আছে। কিন্তু রাত্রে আমি দুধ-মুড়ি কি চিঁড়ে-দই খাই।

—বেশ তো, ফলারেরই ব্যবস্থা করব।

যশোমতী চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরঞ্জয় ভঞ্জ জিম-কর্বেট লজে উপস্থিত হলেন। যশোমতী স্মিতমুখে নমস্কার করলেন, তাঁর নাতি ধ্রুব আর নাতবউ রাকা দুদিক থেকে পুরঞ্জয়ের দুই পা জড়িয়ে ধরে কলধ্বনি করে উঠল।

পুরঞ্জয় বললেন, যশোমতী, এরা তো আমাকে চেনে না, তুমি ইনট্রোডিউস করে দাও।

যশোমতী বললেন, পঞ্চান্ন বছর পরে কাল তোমাকে দেখেছি। আমি তোমার কতটুকু জানি? তুমিই নিজের পরিচয় দাও না।

পুরঞ্জয় বললেন, বেশ। শোন দাদাভাই ধ্রুব, আর কি নাম তোমার রাকা। আমি হচ্ছি ডাক্তার পুরঞ্জয় ভঞ্জ, মেজর, আই.এম.এস, রিটায়ার্ড। চিকিৎসা বিদ্যা এখন প্রায় ভুলে গেছি। বহু কাল আগে তোমাদের এই ঠাকুমার ছেলেবেলার সঙ্গী ছিলুম, আলীপুরে আমাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। ওঁকে খেপাবার জন্যে আমি বলতুম, যশোটা থসথসোটা। উনি আমাকে বলতেন, পুরোটা ঘুরঘুরোটা। আমরা যেন ভাই বোন ছিলুম।

ধ্রুব বলল, শুধুই ভাই বোন?

—তার চাইতে বরং বেশী। একদিন দেখা না হলে অস্থির হতুম।

হিহি করে হেসে রাকা চলল, দাদু, শুনেছি আপনি স্পষ্টবক্তা লোক, রেখে ঢেকে কিছু বলতে পারেন না। কেন কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলবেন? মন খোলসা করে বলে ফেলুন। আমরা সব জানি, আমাদের জেরার চোটে ঠাকুমা সব কবুল করেছেন।

পুরঞ্জয় বললেন, যশো, তুমি দিব্যি একজোড়া শুক-সারী টিয়া-পাখি পুষেছ। এরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে না তো?

হাত নেড়ে রাকা বলল, না না, আপনার কোনও চিন্তা নেই, নির্ভয়ে সত্যি কথা বলুন। ঠাকুমা আর আমরা সবাই খুব উদার, আমাদের কোনও সেকেলে অন্ধ সংস্কার নেই।

—বেশ বেশ। তা হলে নিশ্চয় শুনেছ যে যশোর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড প্রেম হয়েছিল। তার পর ওঁর বিয়ে হয়ে যেতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, মনের দুঃখে আমি বোম্বাইএ গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে

ভর্তি হলুম, তার পর বিলাত গেলুম। কাল পঞ্চান্ন বছর পরে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা তোলপাড় উঠল, যাকে বলে আলোড়ন, বিক্ষোভ, আকুলিবিকুলি।

ধ্রুব বলল, অবাক করলেন দাদু। বুড়ীকে হঠাৎ দেখে বুড়োর ওল্ড ফ্লেম দপ করে জ্বলে উঠল, আগেকার প্রেম উথলে উঠল?

—ঠিক আগেকার প্রেম নয়, অন্য রকম আশ্চর্য অনুভূতি। তোমাদের তা উপলব্ধি করবার বয়স হয় নি। যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। নিশ্চয়ই জান, তোমাদের এই ঠাকুমা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন।

রাকা বলল, আমার চাইতেও?

—মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, তুমি সুন্দরী বট, কিন্তু তোমার সেকালের দিদিশাশুড়ীর তুলনায় তুমি একটি পেঁচী। যদি দৈবক্রমে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে গত পঞ্চান্ন বছরে আমার চোখের সামনেই উনি ক্রমশ বুড়ী হতেন। ধাপে ধাপে নয়, একটানা ক্রমিক পরিবর্তন, কিশোরী থেকে যুবতী, তার পর মধ্যবয়স্কা প্রৌঢ়া, তার পর বৃদ্ধা। সবই সইয়ে সইয়ে তিল তিল করে ঘটত, আমার আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকত না। কবে উনি মোটাতে শুরু করলেন, কবে চশমা নিলেন, কবে দাঁত পড়ল, কবে চুলে পাক ধরল, প্রেমালাপ ঘুচে গিয়ে কবে সাংসারিক নীরস বিষয় একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল, এ সব আমি লক্ষ্যই করতুম না। বৃক্ষলতার যৌবন বার বার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে তেমন হয় না, বাল্য যৌবন জরা আমাদের অবশ্যম্ভাবী, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু সেকালের সেই পরমা সুন্দরী কিশোরী যশো, আর পঞ্চান্ন বৎসর পরে যাকে দেখলুম

সেই বৃদ্ধা যশো—এই দুইএর আকাশপাতাল প্রভেদ, তাই হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলুম।

রাকা বলল, হায় রে পুরুষের মন, রূপ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না! আমি এখনই তো পেঁচী, বুড়ো হলে কি যে গতি হবে জানি না।

—ভয় নেই দিদি। তোমার ক্রমিক রূপান্তর ধ্রুবর চোখের সামনে একটু একটু করে হবে, ও টেরই পাবে না, ডায়ারিতেও নোট করবে না। শেষ বয়সে যদি হাড়গিলে কি শকুনি গৃধিনী হয়ে পড় তাতেও ধ্রুব শক্‌ড হবে না। প্রেমের দুই অংগ, একটা দেহাশ্রিত, আর একটা দেহাতীত। তোমাদের মনে এখন এক সংগে দুটো মিশে আছে। কিন্তু যতই বয়স বাড়বে ততই প্রথমটা লোপ পাবে, শুধু দ্বিতীয়টাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

রাকা বলল, পঞ্চান্ন বছর পরে ঠাকুমাকে হঠাৎ দেখে আপনার মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল তা বুঝলুম, কিন্তু তার ফলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ ঠাকুমার প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম দাঁড়াল?

—পর পর দুটো অনুভূতি হল, যশোমতীর দুই রূপ দেখলুম। ওঁকে ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর হাসি দেখে আর গলার স্বর শুনে পঞ্চান্ন বছর আগেকার সেই তন্বী কিশোরী মূর্তি মনের মধ্যে ফুটে উঠল। তার কিছুমাত্র বিকার হয় নি, একবারে যথাযথ অক্ষয় হয়ে আছে। তার যে পরিবর্তন পরে ঘটেছে তা তো আমি দেখি নি, সেজন্যে তার কোনও প্রভাবই আমার চিত্তস্থিত মূর্তির ওপর পড়ে নি। তার পরেই যশোর অন্য এক রূপ দেখলুম, দেহের নয়, আত্মার। আমার বুদ্ধিতে মন আর আত্মা একই বস্তু, বয়সের সংগে তার পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধারা বজায় থাকে সেজন্য চিনতে পারা যায়। যেমন, নদীর জলপ্রবাহ নিত্য নূতন, কিন্তু প্রবাহিণী একই। যশো-

মতীর কথায় বুঝলুম, উনি সেই আগের মতন সংস্কারের দাসী গুরুজনের আজ্ঞাপালিকা ভীরু মেয়ে নন, ওঁর স্বাধীন বিচারের শক্তি হয়েছে, মনের কথা বলবার সাহস হয়েছে। উনি যদি সেকালের কিশোরী না হয়ে একুশ-বাইশ বছরের আধুনিকী হতেন তবে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আমাকেই বরণ করতেন।

যশোমতী বললেন, এই, তোরা চুপ কর, কেন ওঁকে অত বকাচ্ছিস, খেতে দিবি না?

রাকা বলল, বা রে, উনি নিজেই তো বকবক করছেন, আমরা শুধু একটু উসকে দিচ্ছি। আসুন দাদু, এইবার খেতে বসুন।

যশোমতী বললেন, টেবিলে খাবার দেব কি, না আসন পেতে দেব?

পুরঞ্জয় বললেন, খাওয়াবে তো ফলার। টেবিলে তা মানায় না, আসনই ভাল। মেজেতেই বসব।

খাদ্যের আয়োজন দেখে পুরঞ্জয় বললেন, বাঃ, কি সুন্দর! সাত্ত্বিক ভোজন একেই বলে। সাদা কম্বলের আসন, সাদা পাথরের থালায় ধপধপে সাদা চিঁড়ে, সাদা কলা, সাদা সন্দেশ, সাদা বরফি, সাদা নারকেল কোরা, সাদা পাথরবাটিতে সাদা দই। আবার, সামনে একটি সাদা বেরাল বসে আছে। যশো, তোমার রুচির তুলনা নেই।

রাকা বলল, আসল জিনিসেরই তো বর্ণনা করলেন না। এই পবিত্র শুভ্র খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করেছেন কে? একজন শুভ্রবসনা শুভ্রকেশা শুভ্রকান্তি শুচিস্মিতা সুন্দরী, যাঁর দুটো মূর্তি আপনার চিত্তপটে পার্মানেন্ট হয়ে আছে।

পুরঞ্জয় বললেন, সাধু সাধু, চমৎকার, বহুত আচ্ছা, ওআহ্ খুব, একসেলেণ্ট!

রাকা বলল, দাদু, একটি কথা নিবেদন করি। আমাদের দুজনকে

তো আপনি শুক-সারী বলেছেন। আমি বলি কি, আপনিও আমাদের এই নীড়ে ঢুকে পড়ুন, ঠাঁই আছে। যশোমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করুন। দুটিতে ব্যাঙগমা ব্যাঙগমীর মতন আমাদের কাছে থাকবেন, সবাই মিলে পরমানন্দে দিন যাপন করব।

যশোমতী বললেন, যা যাঃ, বেশী জেঠামি করিস নি।

পুরঞ্জয় বললেন, শোন রাকা দিদি। বুড়ো বুড়ীর বিয়ে বিলাতে খুব চলে, ভবিষ্যতে হয়তো এদেশেও চলবে, যেমন স্মোক্‌ড হ্যাম আর সার্ডিন চলছে। কিন্তু আপাতত এদেশের রুচিতে তা বিকট। তার দরকারও কিছু নেই। যশোমতীর পূর্বরূপের ছাপ আমার মনে পাকা হয়ে আছে, ওঁর আত্মার স্বরূপও আমি উপলব্ধি করেছি, উনিও আমাকে ভাল করেই বুঝেছেন। এর চাইতে বেশী উনিও চান না, আমিও চাই না।

১৮৮১

জয়রাম-জয়ন্তী

জয়রাম নন্দী কোনও অসাধারণ মহাপুরুষ নন, তিনি শুধু অসাধারণ দীর্ঘজীবী। আজ তাঁর শততম জন্মদিন, তাই তাঁর আত্মীয়রা একটু জয়ন্তীর আয়োজন করেছেন। পোলাও আর মাংস রান্না হচ্ছে, কিন্তু এ বাড়িতে নয়, একটু দূরে অন্য বাড়িতে, নয়তো বুড়ো গন্ধ পেয়ে খাবার জন্যে আবদার করবে।

সকালে কমলানেবুর রস আর দুধ-সন্দেশ খাইয়ে বাইরের ঘরে একটা তক্তপোশে অনেকগুলো বালিশে ঠেস দিয়ে জয়রামকে বসানো হয়েছে। আজ রবিবার, সকলেরই ফুরসত আছে। স্বজনবর্গ একে একে এসে প্রণাম করছে, উপহার দিচ্ছে, দু-চারটে কথা বলে অনেকে চলে যাচ্ছে, কেউ বা অল্পক্ষণের জন্যে বসছে।

বয়সের তুলনায় জয়রামের শরীর ভালই আছে। ব্লডপ্রেশার বেশী নেই, ডায়াবিটিস নেই, বাত নেই। চোখে ছানি পড়ে নি, তবে দৃষ্টি কমে গেছে। খাবার লোভ খুব আছে, কিন্তু পেটরোগা। কানে কখনও ভাল শোনেন, কখনও খুব কম শোনেন। দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে স্মৃতির ওলটপালট হয়, অতীত আর বর্তমান গুলিয়ে ফেলেন, কেউ প্রতিবাদ করলে চটে ওঠেন। মেজাজ সাধারণত ভালই থাকে, গল্প করতে ভালবাসেন, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকেন, আবার বুদ্ধিমানের মতন কথাও বলেন। খবর জানবার আগ্রহ খুব আছে, কাগজে কি লিখেছে তা তাঁর নাতির কাছ থেকে প্রত্যহ শোনেন। বেশী তামাক খাওয়া বারণ, কিন্তু জয়রাম হাত থেকে গড়গড়ার নল নামাতে চান না, কলকে নিবে গেলেও টের পান না।

সিমসন স্মিথ অ্যান্ড কম্পানির অফিসে জয়রাম চল্লিশ বছর চাকরি করেছেন, শেষ বিশ বছর বড়বাবুর পদে ছিলেন। মনিবরা উদার, জয়রামকে মোটা পেনশন দেন। তিনি অবসর নিলে তাঁর ছেলে হরেরাম ওই পদ পান। চার বছর হল হরেরামও অবসর নিয়েছেন, এখন তিনি নবদ্বীপে বাস করছেন। তাঁর ছেলে, অর্থাৎ জয়রামের নাতি শিবরাম ওই ফার্মেই কাজ করে, তারও ভবিষ্যতে বড়বাবু হবার আশা আছে।

জয়রাম তিনবার বিবাহ করেছিলেন, এখন তিনি বিপত্নীক। স্নান, কাপড় বদলানো, খাওয়া, মুখ ধোয়া ইত্যাদি নানা কাজে তাঁকে পরের সাহায্য নিতে হয়। রাত্রে অনেক বার তাঁর জন্যে প্রস্রাবের পাত্র এগিয়ে দিতে হয়, সকালে এনিমাও দিতে হয়। একজন দক্ষ চাকর এইসব কাজ করত, কিন্তু জয়রামের গালাগালি সইতে না পেরে সে চলে গেছে। অগত্যা সম্প্রতি একজন নর্স বাহাল করা হয়েছে, লতিকা খাস্তগির। পাস করা নর্স নয়, সেজন্যে তার চার্জ কম। সে সন্ধ্যায় আসে, বেলা আটটায় চলে যায়। তার সেবায় জয়রাম এখন পর্যন্ত তুষ্ট আছেন।

আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জয়রাম প্রসন্ন মনে গল্প করছেন আর মাঝে মাঝে গড়গড়ার নির্ধূম নল টানছেন, এমন সময় তাঁর নাতি শিবরাম এসে বলল, দাদু, মস্ত খবর, আমাদের বড়সায়েব মিস্টার সিমসন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

জয়রাম বললেন, বলিস কি রে, সার চার্লস সিমসন?

—আঃ, তোমার কিছুই মনে থাকে না। সার চার্লস তো তোমার চাইতেও বড় ছিলেন, সেই কবে মান্ধাতার আমলে মারা গেছেন। তাঁর নাতি হ্যারি সিমসন এখন সিনিয়র পার্টনার, তিনিই গুড উইশ জানাতে আসছেন। তোমার সঙ্গে ফার্মের কত কালের সম্পর্ক তা জানেন কিনা।

—জানবেই তো, কত বড় বংশের সায়েব। কিন্তু বসতে দিবি কিসে? বাড়িতে একটাও ভাল চেয়ার নেই।

—ভেবো না, তার ব্যবস্থা আমি করেছি।

জয়রাম চঞ্চল হয়ে বললেন, ওরে শিবু, চট করে আমার সেই জীনের পাতলুন আর মুগার চাপকানটা বের করে আমাকে পরিয়ে দে। তোর বউএর কাছ থেকে একটু খোসবায় এনে ভাল করে মাখিয়ে দিস, যাতে ন্যাফথালিনের গন্ধ চাপা পড়ে। আর, একটা উড়ুনি বেশ করে কুঁচিয়ে পাকিয়ে দে, গলায় দেব। আর, আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সার চার্লস সিমসন যা দিয়েছিলেন।

—কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ দাদু, তুমি যা পরে আছ সেই সাজেই সায়েবের সঙ্গে দেখা করবে। খাতির জানাবার জন্যে কাগ-তাড়ুয়া সাজবার কোনও দরকার নেই।

উপস্থিত স্বজনবর্গের দিকে সগর্বে দৃষ্টিপাত করে জয়রাম বললেন, উঃ, মস্ত লোক ছিলেন সার চার্লস সিমসন। আমাকে কি রকম স্নেহ করতেন, হরদম ডাকতেন, ন্যাণ্ডি ব্যাবু, ন্যাণ্ডি ব্যাবু। ওরে শিবু, জন্মদিনের উপহার কি সব এল তা তো দেখালি নি।

—তা ভালই এসেছে। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, গরদের জোড়, নামাবলী, দুধখাবার রুপোর গেলাস, গড়গড়ার রুপোর মুখনল, বাক্স বাক্স সন্দেশ আর চন্দ্রপুলি, ল্যাংড়া আম, মিহি পেশোয়ারী চাল, গাওয়া ঘি, আরও কত কি।

—পাকা রুই মাছ দিয়েছে?

—না, তা তো কেউ দেয় নি।

—তবে কি ছাই দিয়েছে। তোর বউকে শিগ্‌গির ডাক।

নাতবউ শিবানী আধঘোমটা দিয়ে ঘরে এল। জয়রাম বললেন, এই শিবি, আজ পেশোয়ারী চালের চাট্টি পোলাও করবি, শুধু আমার

জন্যে, বুঝলি? পাঁচ ভূতকে খাওয়ালে ওই টুকু চাল কদিন টিকবে। নতুন বাজার থেকে ভাল পোনা মাছ আনিয়ে দই আদা লংকা গরম মসলা দিয়ে গরগরে করে কালিয়া রাঁধবি—

ডাক্তার উমেশ গুহ বললেন, পোলাও কালিয়া এখন থাকুক সার। আপনার এ বয়সে লঘু পথ্যই ভাল।

—হুঁ। বয়সটা কত ঠাওর করেছ ডাক্তার?

—সেকি, জানেন না? আজ যে আপনি এক শ বছরে পা দিয়েছেন, তাই তো আমরা জয়ন্তী করছি। এমন দীর্ঘ আয়ু কত লোকের ভাগ্যে হয়!

—এক শ বছর না তোমার মুণ্ডু। মোটে সত্তর, এই তো সবে সেদিন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করলুম। এই শিবে শালা আর ওর বাপ হরে ব্যাটা মিছিমিছি বয়স বাড়িয়ে আমাকে ভয় দেখায়, না খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়, আমার সম্পত্তির ওপর ওদের দারুণ টান। শাস্ত্রে লিখেছে না—পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। উমেশ ডাক্তারকেও ওরা হাত করেছে।

শিবানী বলল, কারও কথা শুনবেন না দাদু, আপনার জন্যে পোলাও কালিয়াই রাঁধব। তার পর ডাক্তারের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, শিউলি-বোঁটার রঙ দেওয়া গলা ভাত আর শিঙিমাছের ঝোল।

জয়রাম বললেন, শিবি, তোর দেখছি একটু দয়ামায়া আছে। দুটো ল্যাংড়া আম ছাড়িয়ে দে তো দিদি, আর খান দুই চন্দ্রপুলি, দেখি কেমন উপহার দিয়েছে। চট করে দে, বড়সায়েব আসবার আগেই খেয়ে নি।

—সেকি দাদু, একটু আগেই তো দুধ-সন্দেশ খেলেন! বিকেল বেলা একটু আম আর চন্দ্রপুলি খাবেন এখন।

—সব বেটা বেটী শালা শালী সমান, আমাকে উপোস করিয়ে মেরে ফেলতে চায়। দাঁড়া, সবাইকে কলা দেখাচ্ছি। আমি ফের বিয়ে করব, নতুন বউকে সব সম্পত্তি দেব।

শিবরাম বলল, এমন থুত্থুড়ে যুবো বরকে বিয়ে করবে কে?

—লট্‌কী নর্স বিয়ে করবে। এই লট্‌কী, তোকে পঞ্চাশ ভরি গোট দেব, দু হাতে দশ-দশ গাছা চুড়ি দেব, এই বাড়িখানা তোকে দেব, বিয়ে করতে রাজী আসিছ?

নর্স লতিকা বলল, আহা আগে বলেন নি কেন কত্তাবাবু, আর একজনকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি। আপনি দেখুন না, যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে কি ভয় দেখিয়ে লোকটাকে ভাগাতে পারেন।

নর্স চলে গেলে শিবরাম বলল, দাদু, বেশ তো, লতিকা খাস্তগিরকে বিয়ে কর, মজা টের পাবে। যেমন তুমি চোখ বুজবে অমনি তোমার পেয়ারের লট্‌কী একটা জোয়ান বর বিয়ে করবে আর মনের সাধে দুজনে তোমার সম্পত্তি ওড়াবে।

শিবরামের বড়সায়েব হ্যারি সিমসন এসে পড়লেন। যাঁরা ঘরে ছিলেন তাঁরা সকলেই উঠে গেলেন। মহা খাতির করে শিবরাম সায়েবকে জয়রামের কাছে নিয়ে এল।

জয়রামের শীর্ণ হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সিমসন বললেন, হাডুডু, এ গ্রেট ডে নন্দী বাবু। আপনার জন্মদিন আরও বহুবার আসুক এই কামনা করি। ইউ লুক ভেরি ওয়েল।

হাত জোড় করে গদ্‌গদ স্বরে জয়রাম বললেন, অ্যাজ ইউ হ্যাভ কেপ্ট মি সার, যেমন আমাকে রেখেছেন। উইশ হউ লঙ লাইফ, ইউ,

ইওর মিসিস অ্যান্ড চিলড্রেন। লঙ লিভ মেসার্স সিমসন স্মিথ অ্যান্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, লঙ লিভ কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড ব্রিটিশ এম্পায়ার—

শিবরাম বলল, কি বলছ দাদু, কুইন ভিক্টোরিয়া তো ষাট বছর হল মরেছেন।

—বেগ ইওর পার্ডন। লঙ লিভ কুইন এলিজাবেথ নম্বর টু, আই অ্যাম হার মোস্ট অম্ব্‌ল সবজেক্ট সার।

সিমসন সহাস্যে বললেন, নন্দী বাবু, আপনাদের দেশ বারো বৎসর হল ইনডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে, তার খবর রাখেন না?

হাত নেড়ে জয়রাম বললেন, নো ইনডিপেণ্ডেন্স সার। অ্যাশ, ওনলি অ্যাশ, শুধু ছাই। চাল পঁয়ত্রিশ টাকা, পোনা মাছ পাঁচ টাকা, নো পিওর ঘি।

—যুদ্ধের পর যেমন সব দেশে তেমনি আপনাদের দেশেও দাম চড়ে গেছে। কিন্তু লোকের আয়ও তো বেশ বেড়েছে। দেদার নতুন নতুন বিল্ডিং উঠছে, পথে অসংখ্য মোটর কার চলছে—

—থীভ্‌স সার, অল থীভ্‌স। ব্রিটিশ আমলে আমাদের ছেলে ভাইপো শালা জামাইএর চাকরি জোটানো সহজ ছিল, কারণ আপনাদের আত্মীয়রা কেউ তুচ্ছ কেরানীর কাজ চাইতেন না। কিন্তু এখন একটা সামান্য পোস্টের জন্যে বড় বড় কর্তারা সুপারিশ পাঠান, তাঁদেরও এক পাল বেকার আত্মীয় আছে কিনা?

—তা হলেও তো আপনাদের এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের লোকে মোটের ওপর সুখে আছে।

—নো সার, মোস্ট অনহ্যাপি। ইউনিয়ন অভ রিচ রাসকেল্‌স, ফল্‌স লীডার্স, অ্যান্ড প্রোটেকটেড গুণ্ডাজ। পুওর নেহরু ইজ হেল্পলেস।

জয়রাম ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে সিমসন বললেন, পলিটিক্স থাকুক, আপনার নিজের কথা বলুন নন্দী বাবু।

স্মিতমুখে জয়রাম বললেন, সার, ইউ উইল বি হ্যাপি টু হিয়ার, আমি আবার বিবাহ করছি। একটি ভাল ইয়ং লেডি, আমার অবর্তমানেও যে ফেথফুল থাকবে।

—রিয়ালি? নন্দীবাবু, তার চাইতে একটি গুড ওল্ড লেডি বিয়ে করাই তো ভাল, আপনার যত্ন নেবে।

জয়রাম ঠোঁট উলটে বললেন, ওল্ড লেডি নো গুড।

—আপনি নিজে কি রকম?

—আই ভেরি গুড। আপনাদের তেরোটা ডিপার্টমেণ্ট আমি একাই ম্যানেজ করতে পারি। সার, আমার কথা থাকুক, হোমের কথা বলুন। বড়ই মন্দ খবর শুনছি।

—কি রকম?

—শুনছি ব্রিটেন নাকি ফার্স্ট পাওয়ার থেকে থার্ড পাওয়ারে নেমে গেছে, চায়না আর একটু উঠলেই ব্রিটেন ফোর্থ হয়ে যাবে।

—চিরকাল সমান যায় না নন্দীবাবু। ইণ্ডিয়া যদি মিলিটারি মাইণ্ডেড হয় তবে ব্রিটেন হয়তো ফিফ্‌থ পাওয়ার হয়ে যাবে।

—গড ফরবিড। আরও সব বিশ্রী কথা শুনছি।

—কি শুনছেন?

ছোট ছেলের মতন হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে জয়রাম বললেন, ওই আমেরিকানরা সার। সিটিং অন দাই ব্রেস্ট অ্যাণ্ড পুলিং আউট দাই বিয়ার্ড বাই দি হ্যাণ্ডফুল, বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। বিউটিফুল গার্লস ধরে ধরে নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আর, আমাদের হোলি গীতায় যা আছে—জায়তে বর্ণসংকরঃ। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা চালাচালি করছে। বেশী মদ খেয়ে পাইলট যদি বেসামাল হয়

তবে তো আপনাদের দেশের ওপরেই বোমা ফাটবে। তা হলে কি সর্বনাশ হবে সার!

—যত সব ননসেন্স। ডোণ্ট ওঅরি নন্দীবাবু, আমরা নিরাপদে আছি।

—নো সার, ভেরি গ্রেভ সিটুয়েশন। আপনারা এখানে চলে আসুন, অল ব্রিটিশ পিপ্‌ল, নেহরুজী আপনাদের আশ্রয় দেবেন, যেমন তিব্বতীদের দিয়েছেন। হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর ঠাণ্ডা জায়গা আছে, সেখানে আরামে থাকবেন। আমেরিকা আর রাশিয়া ঝগড়া করে মরুক, লেট ইওরোপ গো টু হেল।

—নন্দীবাবু, এই দেশ কি আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ? শুনেছি আপনাদের এক পাওআরফুল গড আছেন, কল্কি অবতার, মিস্টার নেহরু কোনও রকমে তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। নেহরু যখন থাকবেন না তখন ওই কল্কি অবতার এদেশে অবতীর্ণ হবেন, প্রকাণ্ড তলোয়ার দিয়ে সমস্ত ননহিন্দুকে কেটে ফেলবেন। তার চাইতে পাকিস্তানই তো ভাল, ওরা চিরকালই ফেথফুল, আমাদের তাড়াতে চায় নি।

—পাকিস্তানে জায়গা পাবেন না সার, আমেরিকানরা আপনাদের থাকতে দেবে না। গুড ওল্ড ইণ্ডিয়াই আপনাদের পক্ষে ভাল। কোনও ভয় নেই, শুধু একটা ডিক্লারেশন সই করবেন যে আপনারা স্পিরিচুয়াল হিন্দু। আপনাদের পৈতৃক খ্রীষ্টধর্ম, বীফ, পোর্ক, হুইস্কি কিছুই ছাড়বার দরকার নেই, তবে একখানি গীতা সর্বদা সঙ্গে রাখবেন।

সিমসন বললেন, গুড আইডিয়া, ভেবে দেখব। গুড বাই নন্দীবাবু, আপনি বিশ্রাম করুন। এই এক বাক্স চকোলেট আপনার জন্যে এনেছি, খাবেন।

১৮৮১

গুপী সায়েব

এই লোকটির নাম আপনাদের হয়তো জানা নেই। আমিও তাকে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার যে ইতিহাস নয়নচাঁদ পাইন আর দাশু মল্লিককে বলেছিলুম তাই আজ আপনাদের বলছি। নয়নচাঁদ আর দাশু তা মন দিয়ে শোনেন নি, কারণ তাঁদের তখন অন্য ভাবনা ছিল। আমার বিশ্বাস, গুপী সায়েব অখ্যাত হলেও একজন অসাধারণ গুণী লোক। আশা করি আপনারা যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে তার এই ইতিহাস শুনবেন।

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির ব্যবসা আছে। দাশু মল্লিক তাঁর দূর সম্পর্কের শালা, নেশাখোর, কিন্তু খুব সরল লোক। নয়নচাঁদের ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কনের ঠাকুরদা হৃদয় দাসের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেজন্যে নয়নচাঁদ আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর দাবি সম্বন্ধে আমিই যেন হৃদয় দাসের সঙ্গে কথা বলি। দাবির দুটি আইটেমের ওপর আমাকে বেশী জোর দিতে হবে। এক নম্বর—পাত্রের পিতার জন্যে একটি মোটর গাড়ি অগ্রিম চাই, উত্তম সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হলেও চলবে। দু নম্বর—যেহেতু এদেশে পাত্রের তেমন লেখাপড়া হল না, সেকারণে দাদাশ্বশুরের খরচে তাকে জেনিভা পাঠাতে হবে, ঘড়ি তৈরি শেখবার জন্যে।

আমার দৌত্যের ফল কি হল তা জানবার জন্য দাশু মল্লিক আমার কাছে এসেছেন, নয়নচাঁদও একটু পরে আসবেন। আমি বললুম, দাশুবাবু, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পাইন মশাই এলেই সব খবর বলব। ততক্ষণ একটা বর্মা চুরুট টানুন।

দাশু মল্লিক ধূমপান করতে করতে চুপিচুপি বললেন, দেখ হে, তুমি এই দেনাপাওনার ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে প'ড়ো না, পরে হয়তো লজ্জায় পড়বে। আমার ভাগনে, মানে নয়নচাঁদের ছেলে একটি পাঁঠা।

এমন সময় নয়নচাঁদ এলেন, এসেই একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি প্রশ্ন করলুম, কি হল পাইন মশাই, শরীরটা খারাপ নাকি?

নয়নচাঁদ আঙুল নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি তোমাদের এই বলে রাখলুম, দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, সর্বনাশের আর দেরি নেই।

দাশু মল্লিক আর আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। নয়নচাঁদ বলতে লাগলেন, গেল হপ্তায় মানিকতলা বাজারে পকেট থেকে সাড়ে চোদ্দ টাকা উধাও হল। আবার আজ সকালে কলেজস্ট্রীট মার্কেটে উনিশ টাকা তেত্রিশ নয়াপয়সা মেরে নিয়েছে। তোমাদের মিনমিনে গণতন্ত্রী সরকারকে দিয়ে কিছুই হবে না, জবরদস্ত আয়ুব-শাহী গভরমেণ্ট দরকার, পকেটমার চোর আর ভেজালওয়ালাদের সরাসরি ফাঁসিতে লটকাতে হবে।

দাশু মল্লিক বললেন, যা বলেছ দাদা। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, তেরো-চোদ্দ বছর আগে লীগ মন্ত্রীদের আমলে পুরো একটি বছর পিকপকেটিং একবারে বন্ধ ছিল, নট এ সিংগল কেস। তার পর যেমন স্বাধীনতা এল, আবার যে কে সেই।

আমি বললুম, আপনারা প্রকৃত খবর জানেন না। লীগ মন্ত্রীদের বা পুলিসের কিছুমাত্র কেরামতি ছিল না, পকেটমারদের ঠাণ্ডা করেছিল আমাদের গুপী সায়েব।

নয়নচাঁদ বললেন, তিনি আবার কে?

—আমার এখানে দেখে থাকবেন, এখন ভুলে গেছেন। তেরো-চোদ্দ বছর আগে প্রায়ই এখানে আসত, অতি অদ্ভুত লোক।

—ফিরিঙ্গী নাকি?

—না, খাঁটী বাঙালী। গুপী সায়েবের আসল নাম বোধ হয় গোপীবল্লভ ঘোষ, গোপীনাথ গোপেশ্বর কিংবা গোপেন্দ্রও হতে পারে, ঠিক জানি না। একটা বিস্কুটের কারখানায় কাজ করত। এখনকার ছোকরারা যেমন প্যাণ্ট-শার্ট প'রে গলায় লম্বা টাই উড়িয়ে খালি মাথায় রোদে ঘুরে বেড়ায়, স্বাধীনতার আগের যুগে তেমন ফ্যাশন ছিল না। রামানন্দ চাটুজ্যে মশাই একবার লিখেছিলেন, রোদে বেরুতে হলে মাথায় হ্যাট দেওয়া ভাল, দেশী সাজের সঙ্গেও তা চলতে পারে। গুপী এই উপদেশটি শিরোধার্য করেছিল, ধুতি পঞ্জাবি প'রে মাথায় শোলা হ্যাট দিয়ে বাইসিকল চড়ে ঘুরে বেড়াত। একবার অর্ধোদয় যোগের সময় তাকে দেখেছিলুম, একটা গামছা প'রে আর একটা গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় হ্যাট দিয়ে হাতে কমণ্ডলু ঝুলিয়ে গঙ্গা-স্নানে যাচ্ছে। এই হ্যাটের জন্যেই সবাই তাকে গুপী সায়েব বলত।

নয়নচাঁদ বললেন, তোমার ভণিতা রেখে দাও, পকেট-মারা কিসে বন্ধ হল তাই চটপট বলে ফেল। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে। একটা বিয়ের যোগাড় কি সোজা কথা!

একটু চটে গিয়ে আমি বললুম, গুপী সায়েব হেঁজিপেঁজি লোক নয়, তার ইতিহাস বলতে সময় লাগে, আর ধীরে-সুস্থে তা শুনতে হয়। আপনাদের যখন ফুরসত নেই তখন থাক।

নয়নচাঁদ বললেন, আরে না না, রাগ কর কেন। কি জান, মনটা একটু খিঁচড়ে আছে, তাই ব্যস্ত হয়েছিলুম। হাঁ, ভাল কথা, শুনলুম হৃদয় দাস নাকি একটা ভাল রোভার গাড়ির জন্যে বায়না করেছে। তা হলে কঞ্জুস বুড়োর সুবুদ্ধি হয়েছে?

—তা হয়েছে।

—বেশ বেশ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাক, এখন তুমি গুপী সায়েবের ইতিহাস বল।

আমি বলতে লাগলুম।—

গুপী সায়েব লেখাপড়া বেশী শেখে নি, কিন্তু ছোকরা খুব পরোপকারী ছিল আর হরেক রকম জানোয়ার সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তার মক্কেলও ছিল বিস্তর। পয়সার জন্যে নয়, শখের জন্যেই সে ফরমাশ খাটত, তবে কেউ কিছু দিলে খুশী হয়ে নিত। মনে করুন আপনি একটা ভাল কাবুলী বেরাল চান। গুপী সায়েব ঠিক যোগাড় করে দেবে, এমন বেরাল যার ন্যাজ খ্যাঁকশেয়ালকে হারিয়ে দেয়। আমাদের পাড়ার রাধাশ্যাম গোসাঁইএর নাতির শখ হল একটা বুলডগ পুষবে। কিন্তু বাড়িতে মাংস আনা বারণ। গুপী সায়েব এমন একটা কুত্তা এনে দিল যে ভাত ডাল ডাঁটা-চচ্চড়িতেই তুষ্ট, আর হাড়ের বদলে এক টুকরো কঞ্চি বা একটি পুরনো টুথব্রশ পেলেও তার চলে। কালীচরণ তন্ত্রবাগীশকে মনে আছে? লোকটা গোঁড়া শাক্ত, রাধাকৃষ্ণ কি সীতারাম শুনলে কানে আঙুল দিতেন। তাঁর শখ হল একটি ময়না পুষবেন, কিন্তু বৈষ্ণবী বুলি কপচালে চলবে না। গুপী সায়েব তারাপীঠ না চন্দ্রনাথ কোথা থেকে একটা পাখি নিয়ে এল, সে গাঁজাখোরের মতন হেঁড়ে গলায় শুধু বলত, তারা তারা বল্ শালারা।

সেই সময় হ্যারিসন রোডে বিখ্যাত সিনেমা হাউস ছিল ঝমক মহল। করুগেট লোহার ছাত, তার নীচে কাঠের সীলিং। বহুকালের পুরনো বাড়ি, সীলিংএ অনেক ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে বিস্তর পায়রা ঢুকে ভেতরের কার্নিসে রাত্রিযাপন করত। অডিটোরিয়ম এত নোংরা

হত যে দর্শকরা হল্লা করতে শুরু করল। ম্যানেজার হরমুসজী ছিপিওয়ালা পায়রা তাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। মেরে ফেলবার উপায় নেই, কারণ হিন্দুর চোখে গরু যেমন ভগবতী, তেমনি হিন্দু মুসলমান আর পারসীর চোখে পায়রা লক্ষ্মীর প্রজা। ছিপিওয়ালা সায়েব লোকপরম্পরায় শুনলেন, পায়রা তাড়াতে পারে একমাত্র গুপী সায়েব। তাকে কল দেওয়া হল। সে বলল, খুব সোজা কাজ। রাত বারোটার পর যখন শো বন্ধ হবে আর পায়রার দল বেহুঁশ হয়ে ঘুমুবে তখন দু-তিন জন লোক লাগিয়ে দেবেন। তারা মই দিয়ে উঠবে আর প্রত্যেকটি পায়রার পেট টিপে ছেড়ে দেবে। পায়রার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ন নয়, সেজন্যে দিন কতক নিয়মিত ভাবে পেট টেপা দরকার। ক্রমশ তাদের হৃদয়ংগম হবে যে এই ঝমক মহল সিনেমা ভবন পায়রার পক্ষে মোটেই নিরাপদ আশ্রয় নয়। গুপী সায়েবের ব্যবস্থা অনুসারে হরমুসজী ছিপিওয়ালা প্রাত্যহিক পেট টেপার অর্ডার দিলেন, দিন কতক পরেই পায়রার দল বিদায় হল। গুপী পঁচিশ টাকা দক্ষিণা পেল। তার কয়েক মাস পরে সিনেমা হাউসের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় ছিপিওয়ালা সায়েব নাগপুরে চলে গেলেন, ঝমক মহলের মালিক পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন হাউস বানালেন।

একদিন গুপী সায়েব আমার এখানে এসেছে, তার ডান হাতে রবারের দস্তানা, বাঁ হাতে একটা দেশলাইএর বাক্স। আমরা প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি? গুপী সায়েব জবাব দিল না, ফরাসের ওপর দুখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে দেশলাইএর বাক্স খুলে তার ওপর ঢালল। ছোট ছোট জুঁই ফুলের কুঁড়ির মতন সাদা পদার্থ। গুপী বলল, ডেয়ো পিঁপড়ের ডিম, বারো টাকা ভরি, দু আনা দিয়ে এক রতি কিনেছি, খুব পোষ্টাই। তার পর দস্তানা পরা ডান হাত পকেটে পুরে আবার বের করল, কাঁকড়াবিছেতে হাত ছেয়ে গেছে। আমরা ত্রস্ত

হয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে গেলুম। কাঁকড়াবিছের দল গুপীর হাত থেকে কাগজের ওপর পড়ল আর টুপ টুপ করে সমস্ত পিঁপড়ের ডিম খেয়ে ফেলল। তার পর গুপী সায়েব তার পোষা জানোয়ারদের আবার পকেটে পুরল।

আমরা সবাই বললুম, তোমার এ কিরকম ভয়ংকর শখ? কোন্ দিন বিছের কামড়ে মারা যাবে দেখছি।

গুপী সায়েব বলল, আপনারা জানেন না, কাঁকড়াবিছে অতি উপকারী প্রাণী। বিছানায় ছারপোকা হয়েছে? কীটিংস পাউডারে কিছু হচ্ছে না? (তখন ডিডিটি ইত্যাদি বেরোয় নি)। গুটিকতক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিন, তিন-চার দিন অন্য ঘরে রাত্রিযাপন করুন, তার পর দেখবেন ছারপোকা নির্বংশ, আণ্ডা বাচ্চা ধাড়ী সমস্ত সাবাড়। আলমারি কি দরজা-জানালায় উই লেগেছে? ভাঁড়ার ঘরে পিঁপড়ে? তারও দাবাই কাঁকড়াবিছে।

জিতেন বোসের নাম শুনে থাকবেন। ভদ্রলোকের পুরনো বই সংগ্রহের বাতিক আছে। একদিন এখানে আড্ডা দিতে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, আর তো পারা যায় না, কলকাতার যত রিসার্চ স্কলার আর পি-এচ. ডি. আছেন সবাই আমার ওপর হামলা করছেন। কেবলই বলেন, এই বইটা দু দিনের জন্যে দাও, ওইখানা সাত দিনের জন্যে দাও। বই দিলে কিন্তু ফেরত আসে না। ওমর খাইয়ামের স্বহস্তে লেখা একটি মহামূল্য পুঁথি আমার আছে। ডকটর সীতারাম নশকর সেই পুঁথিটি বাগাতে চান, একজন জর্মন প্রোফেসরকে দেখাবেন। নশকর মশাইকে হাঁকিয়ে দিতে পারি না, এককালে তাঁর কাছে পড়েছিলুম। তানানানা করে এতদিন কাটিয়েছি, কিন্তু আসছে রবিবারে তিনি আবার আসবেন, কি ছুতো করব তাই ভাবছি।

দৈবক্রমে গুপী সায়েব উপস্থিত ছিল। সে বলল, আপনি

ভাববেন না জিতেনবাবু। আপনার প্রত্যেক আলমারিতে আমি পাঁচটি করে কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব আর গুটিদশেক ডিম। কেউ বই চাইলে বলবেন, আলমারি বিছেয় ভরতি, বই নিতে পারেন অ্যাট ইওর রিস্ক।

জিতেনবাবু রাজী হলেন, গুপী সায়েব যথোচিত ব্যবস্থা করল। তার পর ডকটর নশকর এসে ওমর খাইয়াম চাইলেন। জিতেনবাবু বললেন, মহা মুশকিল সার, সব আলমারি বিছেয় ভরে গেছে। এই সেদিন আমার ভাগনেকে কামড়েছে, বেচারা হাসপাতালে আছে। আমার তো হাত দেবার সাহস নেই। আপনি যদি নিরাপদ মনে করেন তবে বইটা খুঁজে বের করে নিতে পারেন। ডকটর নশকর সন্দিগ্ধ মনে আলমারিতে উঁকি মেরে দেখলেন, কাঁকড়াবিছে সঙিন খাড়া করে পাহারা দিচ্ছে। তিনি তখনই ওব্বাবা বলে প্রস্থান করলেন।

এইবার গুপী সায়েবের মহত্তম অবদানের কথা শুনুন। কিছুকাল তার দেখা পাই নি, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন বেজে উঠল। কে আপনি? উত্তর এল, আমি গুপী, আপনাদের গুপী সায়েব, মুচীপাড়া থানা থেকে বলছি। আমাকে গ্রেপতার করেছে, শিগ্‌গির আসুন, বেল দিতে হবে।

থানায় গিয়ে দেখলুম, একটা সরু কাঠের বেঞ্চে ব'সে গুপী সায়েব পা দোলাচ্ছে, দারোগা গুলজার হোসেন তাঁর চেয়ারে বসে কটমট করে তার দিকে চেয়ে আছেন। গুপীর পাশেই বেঞ্চে আর একটি লোক বসে আছে, রোগা, বেঁটে, অল্প দাড়ি আছে, পরনে ময়লা ইজার ফরসা জামা, মাথায় টুপি। লোকটি কাতর স্বরে মাঝে মাঝে 'বাপ রে বাপ' বলছে আর একটা গামলায় বরফ দেওয়া জলে হাত ডোবাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ইনস্পেকটার সাহেব?

গুলজার হোসেন বললেন, এই গোপী ঘোষ আপনার ফ্রেন্ড? অতি ভয়ানক লোক, এই বেচারা চোট্টু মিঞার জান লিয়েছেন।

ব্যাপার যা শুনলুম তা এই।—গুপী সায়েব বউবাজারে কি কিনতে গিয়েছিল। চোট্টু মিঞা পকেট মারবার জন্যে গুপীর পকেটে হাত পোরে, সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাঁকড়াবিছে তাকে কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় চোট্টু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন দুজন পাহারাওয়ালা তাকে আর গুপী সায়েবকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

আমি নিবেদন করলুম, চোট্টু মিঞা পকেট মারবার চেষ্টা করেছিল, তাকে আপনারা অবশ্যই প্রসিকিউট করবেন। কিন্তু গুপী সায়েবের কসুর কি? ওঁকে তো আটকাতে পারেন না।

দারোগা সায়েব গর্জন করে বললেন, আমাকে আইন শিখলাবেন না মশয়। এই গোপী একজন খুনী, ডেঞ্জার টু দি পবলিক। গরিব বেচারা চোট্টু মিঞা একটু আধটু পাকিট মারে, কিন্তু তার জন্যে আমরা আছি, সোরাবর্দি সাহেব আছেন, লাট সাহেব ভি আছেন। চোট্টুর জান নেবার কোনও ইখতিয়ার আপনার এই ফ্রেণ্ডের নেই।

আমার কথায় কোনও ফল হল না। এক শ টাকার বেল দিয়ে গুপীকে খালাস করে নিয়ে এলুম। পাঁচ দিন পরে ব্যাংকশল স্ট্রীটের কোর্টে মকদ্দমা উঠল, শুধু গুপীর কেস। পকেটমার চোট্টুর বিচার পরে হবে, সে তখনও হাসপাতালে।

সরকারী উকিল বললেন, ইওর অনার, এই আসামী গোপী ঘোষকে কড়া সাজা দেওয়া দরকার। পিকপকেটকে বাধা দেবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তাকে খুন বা নিমখুন করা মারাত্মক অপরাধ। হুজুর সেই বহুকালের পুরনো কেস ক্রাউন ভার্সস ভিখন পাসীর নজিরটি দেখুন। ভিখন পাসী তাড়ি তৈরি করত, তালগাছে ঝোলানো তার ভাঁড় থেকে রোজই তাড়ি চুরি যেত। চোরকে জব্দ করার মতলবে ভিখন ধুতরো ফলের রস ভাঁড়ের মধ্যে রাখল। পরদিন

একটা তাড়িচোর মারা পড়ল, আর একটা কোনও গতিকে বেঁচে গেল। হাকিম রায় দিলেন, চোরের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক উপায় অবলম্বন করা গুরুতর অপরাধ। ভিখন পাসীর এক বছর জেল আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়েছিল।

গুপী সায়েবের উকিল বললেন, ইওর অনার, আমার মক্কেলের কেস একবারে আলাদা। কোনও লোককে জব্দ করবার মতলব বা ম্যালিস প্রিপেন্স এঁর ছিল না, পিকপকেটদের প্রতিও ইনি শত্রুভাবাপন্ন নন। ইনি শখ করে কাঁকড়াবিছে পোষেন, তাদের ট্রেনিং দেন, আদর করেন, ভালবাসেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। কি করে ইনি জানবেন যে পুওর ফেলো চোট্টুর মতিচ্ছন্ন হবে? ইনি তার অনিষ্টচেষ্টা করেন নি, এঁর পালিত অবোধ প্রাণীরাই আত্মরক্ষার জন্যে চোট্টুকে কামড়ে দিয়েছিল। চোট্টু মিঞার প্রতি আমার ক্লায়েণ্টের খুব সিমপাথি আছে, কিন্তু এঁর দায়িত্ব কিছুই নেই।

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী ভুক্তভোগী লোক, বার দুই তাঁরও পকেট মারা গিয়েছিল। হাসি চেপে বললেন, পকেটে কাঁকড়াবিছে নিয়ে বাজারে যাওয়া অন্যায় কাজ। আসামী অপরাধী। ওঁকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আর যেন এমন না করেন। আচ্ছা গোপীবাবু, আপনি যেতে পারেন।

গুপী সায়েব নমস্কার করে করজোড়ে বলল, হুজুর, একটা কোশ্চেন করতে পারি কি?

হাকিম বললেন, কি কোশ্চেন?

—আজ্ঞে, পঞ্জাবির পকেটে কাঁকড়াবিছে রাখা আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু যদি কোট পরি, তার পকেটের ওপর যদি বোতাম দেওয়া ফ্ল্যাপ থাকে, আর তার গায়ে যদি একটি নোটিস সেঁটে দিই—

প্যাকিট মে বিচ্ছু হৈ, হাথ ঘুসানা খতরনাক হৈ—তা হলে কি বেআইনী হবে?

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী একটু চিন্তা করে বললেন, না, তা হলে বেআইনী হবে না। কিন্তু মাইন্ড ইউ, আমি হাকিম হিসেবে মত প্রকাশ করছি না, একজন সাধারণ লোক হিসেবেই বলছি।

গুপী সায়েব খালাস হল, তার কিছু আক্কেলও হল। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি তার কিছুমাত্র ছিল না। আমি বললুম, তোমার শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগরে না? কালই সেখানে যাও, হাজার খানিক মাটির কাঁকড়াবিছে অর্ডার দিয়ে এস, দাড়ার নীচে যেন ফাউন্টেন পেনের মতন ক্লিপ থাকে। বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না, আমরা পাঁচজন মুখে মুখেই জিনিসটি চালু করে দেব। গুপী সায়েব হাজারটা নকল বিছে আনাল, বিশ দিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল। খুব ডিমান্ড, আরও আনাতে হল। চোট্টু মিঞার দুর্ভোগের খবর পিকপকেট সমাজে রটে গিয়েছিল, পথচারী ভদ্রলোকদের পকেট থেকে দুটি দাড়া উঁকি মারছে দেখে তারা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল, তাদের পেশা একদম বন্ধ হয়ে গেল। তার পর ক্রমশ জানাজানি হল যে আসল বিছু নয়, মাটির তৈরী। পকেটমারদের ভয় ভেঙে গেল, তারা আবার ব্যবসা শুরু করল।

ইতিহাস শুনে নয়নচাঁদ বললেন, হুঁ, দিব্যি আষাঢ়ে গল্প বানিয়েছ। এখন কাজের কথা বল। হৃদয় দাস মোটর কিনছে ভাল কথা। আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে রাজী আছে তো?

বিষণ্ণ মুখে আমি বললুম, আজ্ঞে না। মোটর কিনছেন নিজের জন্যে। নাতজামাইকে বিলেত পাঠাতে পারবেন না।

—বটে! আমার ছেলেকে জলের দরে পেতে চান?

—আজ্ঞে না, অন্য জায়গায় নাতনীর সম্বন্ধ স্থির করেছেন। কি জানেন পাইন মশাই, আপনি ধনী মানী লোক, কাজেই অনেকের চোখ টাটায়। হিংসুটে লোকে ছেলের নামে ভাংচি দিয়েছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে, ষাঁড়ের গোবর।

১৮৮১

গুলবুলিস্তান

(আরব্য উপন্যাসের উপসংহার)

সম্প্রতি আরব্য উপন্যাসের একটি প্রাচীন পুঁথি উজবেকীস্তানে পাওয়া গেছে। তাতে যে আখ্যান আছে তা প্রচলিত গ্রন্থেরই অনুরূপ, কেবল শেষ অংশ একবারে অন্যরকম। বিচক্ষণ পণ্ডিতরা বলেন, এই নবাবিস্কৃত পুঁথির কাহিনীই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য, নীতিসংগতও বটে। আপনাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যে সেই উজবেকী উপসংহার বিবৃত করছি। কিন্তু তা পড়বার আগে প্রচলিত আখ্যানের আরম্ভ আর শেষ অংশ জানা দরকার। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

শাহরিয়ার ছিলেন পারস্য দেশের বাদশাহ, আর তাঁর ছোট ভাই শাহজমান তাতার দেশের শাহ। দৈবযোগে তাঁরা প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁদের বেগমরা মায় সখী আর বাঁদীর দল সকলেই ভ্রষ্টা। তখন দুই ভাই নিজ নিজ অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন এবং সংসারে বীতরাগ হয়ে একসঙ্গে পর্যটনে নির্গত হলেন।

স্ত্রীচরিত্রের আর একটি নিদর্শন তাঁরা পথে যেতে যেতেই পেলেন। এক ভীষণ দৈত্য তার সুন্দরী প্রণয়িনীকে সিন্দুকে পুরে সাতটা তালা লাগিয়ে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে সে সুন্দরীকে হাওয়া খাওয়াবার জন্যে সিন্দুক থেকে বার করত এবং তার কোলে

মাথা রেখে ঘুমুত। সেই অবসরে সুন্দরী নব নব প্রেমিক সংগ্রহ করত। দুই ভ্রাতাও তার প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

শাহরিয়ার তাঁর কনিষ্ঠকে বললেন, ভাই, এই ভীষণ দৈত্য তার প্রণয়িনীকে সিন্দুকে বন্ধ করে সাতটা তালা লাগিয়েও তাকে আটকাতে পারে নি, আমরা তো কোন ছার। বিবাগী দরবেশ হয়ে লাভ নেই, আমরা আবার বিবাহ করব। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস নেই, এক রাত্রি যাপনের পরেই পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করে পরদিন আবার একটা বিবাহ করব, তা হলে অসতী-সংসর্গের ভয় থাকবে না। দুই ভ্রাতা একমত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং প্রাত্যহিক বিবাহ আর নিশান্তে মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে অনাবিল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শাহরিয়ারের উজিরের দুই কন্যা, শহরজাদী ও দিনারজাদী। শহরজাদীর সনির্বন্ধ অনুরোধে উজির তাঁকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করলেন। রাত্রিকালে শহরজাদী স্বামীকে জানালেন, ভগিনীর জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। দিনারজাদীকে তখনই রাজপ্রাসাদে আনা হল। শাহরিয়ার আর শহরজাদীর শয়নগৃহেই দিনারজাদী রাত্রিযাপন করলেন। শেষ রাত্রে তিনি বললেন দিদি, আর তো দেখা হবে না, বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তো একটা গল্প বল। শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, সকাল না হওয়া পর্যন্ত গল্প বলতে পার।

শহরজাদীর গল্প শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হলেন, কিন্তু গল্প শেষ হল না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা, কাল রাত্রিতে বাকীটা শুনব, একদিনের জন্যে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ মুলতবী থাকুক। পরের রাত্রিতে শহরজাদী গল্প শেষ করলেন এবং আর একটি আরম্ভ করলেন। তারও শেষ অংশ শোনবার জন্যে বাদশাহের কৌতূহল হল, সুতরাং শহরজাদীর জীবনের মেয়াদ আর একদিন বেড়ে গেল। এইভাবে

শহরজাদী এক হাজার একরাত্রি যাবৎ গল্প চালালেন এবং বেঁচেও রইলেন। পরিশেষে শাহরিয়ার খুশী হয়ে বললেন, শহরজাদী, তোমাকে কতল করব না, তুমি আমার মহিষী হয়েই বেঁচে থাক। তোমার ভগিনী দিনারজাদীর সঙ্গে আমার ভাই শাহজমানের বিবাহ দেব। অতঃপর শহরজাদীর সঙ্গে শাহরিয়ার এবং দিনারজাদীর সঙ্গে শাহজমান পরম সুখে নিজ নিজ রাজ্যে কালযাপন করতে লাগলেন।

এখন আরব্যরজনীর উজবেকী উপসংহার শুনুন।

হাজার-এক রাত্রি শেষ হলে শাহরিয়ার প্রসন্নমনে বললেন, শহরজাদী, তুমি যেসব অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছ তা শুনে আমি অতিশয় তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে মরতে হবে না।

শহরজাদী যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

দিনারজাদী বললেন, জাহাঁপনা, এতদিন আপনি শুধু দিদির গল্পই শুনলেন, পুরস্কার স্বরূপ জীবনদানও করলেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছুই শুনলেন না।

শাহরিয়ার বললেন, তুমিও গল্প জান নাকি? বেশ, শোনাও তোমার গল্প।

দিনারজাদী বললেন, আমি যা বলছি তা গল্প নয়, একবারে খাঁটী সত্য। জাহাঁপনা, আপনি তো বিস্তর স্ত্রীর সংসর্গে এসেছেন, এমন কাকেও জানেন কি যার তুলনা জগতে নেই?

—কেন, তোমার এই দিদি আর তুমি।

—আমাদের চাইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ নারী আছে, তার বৃত্তান্ত আমার প্রিয়সখী গুলবদনের কাছে শুনেছি। তার দেশ বহু দূরে। ছ মাস আগে একদল হূন দস্যু তাকে হরণ করে ইস্পাহানের হাটে

নিয়ে এসেছিল, তখন আমার বাবা এক শ দিনার দাম দিয়ে তাকে কেনেন। গুলবদনের সঙ্গে একটু আলাপ করেই আমি বুঝলাম, সে সামান্য ক্রীতদাসী নয়, উচ্চ বংশের মেয়ে, গুলবুলিস্তানের শাহজাদী-দের আত্মীয়া।

—গুলবুলিস্তান কোন্ মুলুক? তার নাম তো শুনি নি।

—যে দেশে প্রচুর গোলাপ তার নাম গুলিস্তান। আর যে দেশে যত গোলাপ তত বুলবুল, তার নাম গুলবুলিস্তান। এই দেশ হচ্ছে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে বল্খ উপত্যকায়। জানেন বোধ হয়, অনেক কাল আগে মহাবীর সেকেন্দর শাহ এই পারস্য সাম্রাজ্য আর পূর্বদিকের অনেক দেশ জয় করেছিলেন। দিনকতক তিনি সসৈন্যে গুলবুলিস্তানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজে আর তাঁর দু শ সেনাপতি ওখানকার অনেক মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমান গুলবুলিস্তানীরা তাঁদেরই বংশধর। ওদেশের পুরুষরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর মেয়েরা অত্যন্ত রূপবতী। তাদের গায়ের রঙ গোলাপী, গাল যেন পাকা আপেল, চোখের তারা নীল, চিবুকের গড়ন গ্রীক দেবীমূর্তির মতন সুগোল। স্বয়ং সেকেন্দর শাহ ওদেশের রাজার পূর্বপুরুষ। এখন রাজা জীবিত নেই, দুই শাহজাদী রাজ্য চালাচ্ছেন, উৎফুলুন্নেসা আর লুৎফুলুন্নেসা।

—ও আবার কিরকম নাম!

—আজ্ঞে, গ্রীক ভাষার প্রভাবে অমন হয়েছে। নিকটেই হিন্দ্ মুলুক, তার জন্যেও কিছু বিগড়েছে। গুলবুলিস্তান অতি দুর্গম স্থান, অনেক পর্বত নদী মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়। পথে একটি গিরিসংকট আছে, বাব-এল-মৈমুন, অর্থাৎ বানর-তোরণ। দুই খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতি সরু পথ, একলক্ষ সুশিক্ষিত বানর সেখানে পাহারা দেয়, কেউ এলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। শোনা

যায় বহুকাল আগে ওদেশের এক রাজা বংগাল মুলুক থেকে এই সব বানর আমদানি করেছিলেন। জাহাঁপনা, আমি বলি কি, আপনি আর আপনার ভাই শাহজমান সেই বুলবুলিস্তান রাজ্যে অভিযান করুন, শাহজাদী উৎফুল আর লুৎফুলকে বিবাহ করুন। আমার সখী গুলবদন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আপনাদের সঙ্গে গেলে সেও নিরাপদে নিজের দেশে ফিরতে পারবে।

শাহরিয়ার বললেন, আমরা যাকে-তাকে বিবাহ করতে পারি না। সেই দুই শাহজাদী দেখতে কেমন? তাদের চরিত্র কেমন?

—জাহাঁপনা, তাঁদের মতন রূপবতী দুনিয়ায় নেই, তেমন ভীষণ সতীও পাবেন না। তাঁদের যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য। আপনারা দুই ভাই যদি সেই দুই শাহজাদীকে বিবাহ করেন তবে স্বর্গের হুরীর মতন স্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও পাবেন।

—তোমার দিদি কি বলেন?

শহরজাদী বললেন, জাহাঁপনা, আমার জন্যে ভাববেন না, আপনাকে সুখী করবার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি।

একটু চিন্তা করে শাহরিয়ার বললেন, বেশ, আমি আর শাহজমান শীঘ্রই গুলবুলিস্তান যাত্রা করব। সঙ্গে দশ হাজার তীরন্দাজ, দশ হাজার বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার আর ত্রিশ হাজার টাঙিগধারী পাইক সৈন্য নেব।

দিনারজাদী বললেন, অমন কাজ করবেন না জাহাঁপনা, তা হলে গুলবুলিস্তানে পৌঁছুবার আগেই সসৈন্যে মারা যাবেন। বাব-এল-মৈমুন গিরিসংকটে যে এক লক্ষ বানর আছে তারা পাথর ছুড়ে সবাইকে সাবাড় করবে। তা ছাড়া শাহজাদীদের পাঁচ হাজার হাতি আছে, আপনার সৈন্যদের তারা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। আমি যা বলি শুনুন। সঙ্গে শুধু পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নেবেন, আপনার পঁচিশ

আর ছোট জাহাঁপনার পঁচিশ। আপনার যে দুজন জোয়ান সেনাপতি আছেন, শমশের জঙ্গ্ আর নওশের জঙ্গ্, তাদেরও নেবেন।

—কিন্তু সেই বাঁদরদের ঠেকাবে কি করে?

—শুনুন। এখন রমজান চলছে, কিছুদিন পরেই ঈদ-অল-ফিত্‌র। এই সময় দেশের আমির ফকির সকলেই জালা জালা শরবত খায়, তার জন্যে হিন্দুস্তান থেকে রাশি রাশি তখ্‌ত-ই-খণ্ডেসরি অর্থাৎ খাঁড় গুড়ের পাটালি বসরা বন্দরে আমদানি হয়। আপনি সেই পাটালি হাজার বস্তা বাজেয়াপ্ত করুন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাব-এল-মৈমুনের কাছে এসে পথের দুই ধারে সেই পাটালি ছড়িয়ে দেবেন। বাঁদরের দল হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর কাড়াকাড়ি করবে, তখন আপনারা অনায়াসে পার হয়ে যাবেন।

শাহরিয়ার বললেন, বাঃ তোমার খুব বুদ্ধি, যদি পুরুষ হতে তো উজির করে দিতাম। যেমন বললে সেই রকমই ব্যবস্থা করব। শাহজমানের কাছে আজই দূত পাঠাচ্ছি। তোমরা দুই বোন আর তোমাদের সখী গুলবদন যাবার জন্য তৈরী হও।

দিনারজাদীর পরামর্শ অনুসারে যাত্রার আয়োজন করা হল। কিছুদিন পরে শাহরিয়ার শাহজমান শহরজাদী দিনারজাদী, দুই সেনাপতি আর পঞ্চাশ জন অনুচর গুলবদনের প্রদর্শিত পথে নিরাপদে গুলবুলিস্তানে পৌঁছুলেন।

চার জন রক্ষীর সঙ্গে গুলবদন এগিয়ে গিয়ে শাহরিয়ার ইত্যাদির আগমন-সংবাদ দুই শাহজাদীকে জানালেন। তাঁরা মহা সমাদরে অতিথিদের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির পর বড় শাহজাদী উৎফুল্লুন্নেসা বললেন, মহামহিম পারস্যরাজ ও তাতাররাজ

কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন তা প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

শাহরিয়ার উত্তর দিলেন, হে গুলবুলিস্তানের শ্রেষ্ঠ গোলাপী বুলবুল দুই শাহজাদী, যা শুনেছিলাম তার চাইতে তোমরা ঢের বেশী সুন্দরী। আমরা একবারে বিমোহিত হয়ে গেছি, তোমরা দুই ভগিনী আমাদের দুজনের বেগম হও।

শাহজাদী উৎফুল বললেন, তা বেশ তো, আমাদের আপত্তি নেই, বিবাহে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। আপনাদের দলে এই যে দুজন সুন্দরী দেখছি এঁরা কে?

শাহরিয়ার বললেন, ইনি হচ্ছেন আমার এখনকার বেগম শহরজাদী, আর উনি আমার শালী দিনারজাদী, আমার ভাইএর বাগ্‌দত্তা। সপত্নীর সংগে থাকতে এঁদের কোনও আপত্তি নেই।

মাথা নেড়ে উৎফুল বললেন, তবে তো আমাদের সংগে বিবাহ হতে পারে না। আমাদের নীতিশাস্ত্র কলীলা-ওঅ-দিম্‌না অনুসারে পুরুষের এককালে একাধিক স্ত্রী আর স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ।

—তুমি যে ধর্মবিরুদ্ধ খৃীষ্টানী কথা বলছ শাহজাদী। স্ত্রীর পক্ষেই একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ, পুরুষের পক্ষে নয়।

—আপনাদের রীতি এখানে চলবে না। আমাদের শরিয়ত অন্য রকম, তা যদি না মানেন তবে আপনাদের সংগে আমাদের বিবাহ হবে না।

শাহরিয়ার তাঁর ভাই শাহজামানের সংগে কিছুক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শ করলেন। তার পর বললেন, বেশ, তোমাদের রীতিই মেনে নিচ্ছি। শহরজাদী, তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি আর আমার বেগম নও। তোমার জন্যে সত্যই আমি দুঃখিত। কি করা যায় বল, সবই

আল্লার মর্জি। তোমার জন্যে আমি অন্য একটি ভাল স্বামী যোগাড় করে দেব।

শাহজমান বললেন, দুনিয়াজাদী, আমিও তোমাকে চাই না। তুমি অন্য কাকেও বিবাহ ক'রো।

অনন্তর সানাই ভেঁপু, কাড়া-নাকাড়া আর দামামা বেজে উঠল, সখীর দল নাচতে লাগল, গুলবুলিস্তানের মোল্লারা শাহরিয়ারের সঙ্গে উৎফুলের আর শাহজমানের সঙ্গে লুৎফুলের বিবাহ যথারীতি সম্পাদন করলেন।

বিকাল বেলা প্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উদ্যানে ফোয়ারার কাছে বসে শাহরিয়ার বললেন, প্রেয়সী উৎফুল, তোমাদের সখীরা অতি খাসা, অনেকে তোমাদের দুই বোনের চাইতেও খুবসুরত। আমরা দুই ভাই ওদের ভাগাভাগি করে আমাদের হারেমে রাখব।

উৎফুল বললেন, খবরদার প্রাণনাথ, আমাদের সখী বাঁদী ঝাড়ুদারনী বা অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে যদি কুদৃষ্টি দাও তো তোমার গরদান যাবে।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে শাহরিয়ার বললেন, ইন্‌শাল্লাহ্‌! মুখ সামলে কথা বল প্রিয়ে, গরদান নেওয়া আমারও ভাল রকম অভ্যাস আছে।

উৎফুল বললেন, এস আমার সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাঁদী, এখনই চারজন মশালচী আর দশজন রক্ষীকে গরদানি মহলে যেতে বল।

দুই শাহজাদী স্বামীদের নিয়ে সুবিশাল গরদানি মহলে প্রবেশ করলেন। মশালের আলোকে দুই ভ্রাতা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে বিস্তর গোঁজ পোঁতা আছে, তা থেকে সারি সারি

নরমুণ্ড ঝুলছে। তাদের দাড়ি হরেক রকম, কাঁচা, কাঁচা-পাকা, গালপাট্টা, ছাগল দাড়ি, লম্বা দাড়ি, গোঁফহীন দাড়ি ইত্যাদি।

উৎফুল্লুন্নেসা বললেন, শোন বড় জাহাঁপনা আর ছোট জাহাঁপনা, এই সব মুণ্ড হচ্ছে আমাদের ভূতপূর্ব স্বামীদের। উত্তরদিকের দেওয়ালে আমার স্বামীদের, আর দক্ষিণের দেওয়ালে লুৎফুলের। বিবাহের পর এরা প্রত্যেকেই আমাদের সখীদের প্রতি লোলুপ নয়নে চেয়েছিল, সেজন্যে আমাদের নিয়ম অনুসারে এদের কতল করা হয়েছে। তোমরা যেমন কুলটা স্ত্রীকে দণ্ড দাও, আমরা তেমনি লম্পট স্বামীকে দিই। ওহে শাহরিয়ার আর শাহজমান, যদি হুঁশিয়ার না হও তবে তোমাদেরও এই দশা হবে। খবরদার, তলোয়ারে হাত দিও না, তা হলে আমাদের এই রক্ষীরা এখনই তোমার গরদান নেবে।

শাহরিয়ার বললেন, পিশাচী রাক্ষসী ঘুলী ইবলিস-নন্দিনী, তোমাদের মনে কি দয়া মায়া নেই?

—তোমাদের চাইতে ঢের বেশী আছে। তোমরা প্রতিদিন নব নব বধূ ঘরে এনেছ, এক রাত্রির পরেই প্রত্যেককে হত্যা করেছ। তাদের চরিত্র ভাল কি মন্দ তা না জেনেই মেরে ফেলেছ। আমরা অত নির্দয় নই, বিনা দোষে পতিহত্যা করি না। যদি দেখি লোকটা অন্য নারীর উপর নজর দিচ্ছে তবেই তার গরদান নিই।

শাহজমান চুপি চুপি বললেন, দাদা, মুণ্ডুগুলো মাটির কি প্লাস্টিকের তৈরী নয় তো?

শাহরিয়ার বললেন, না, তা হলে মাছি বসত না। অবশ্য একটু গুড় লাগালেও মাছি বসে। যাই হক, এই শয়তানীদের কবল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে যদি প্রচুর সৈন্য থাকত তবে সখীর দল সমেত এদের গ্রেপতার করে নিয়ে যেতাম।

তার পর শাহরিয়ার গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, শাহজাদী, তোমাদের আমরা তালাক দিলাম, এখনই দেশে ফিরে যাব।

উৎফুল বললেন, তোমাদের তালাক-বাক্য গ্রাহ্য নয়, এখানকার আইন আলাদা। আমরা ছেড়ে না দিলে তোমাদের এখান থেকে মুক্তি নেই।

—তবে এই সখীদের সরিয়ে দাও, ওরা চোখের সামনে থাকলে আমাদের লোভ হবে।

—ওরা এখানেই থাকবে, নইলে তোমাদের চরিত্রের পরীক্ষা হবে কি করে।

মাথা চাপড়ে শাহরিয়ার বললেন, হা, আমাদের পারস্য আর তাতার রাজ্যের কি হবে?

উৎফুল বললেন, তার জন্যে ভেবো না। তোমার সেনাপতি শমশের জঙ্গ্ শহরজাদীকে বেগম করে পারস্যের সিংহাসনে বসবে আর নওশের জঙ্গ্ দিনারজাদীকে বেগম করে তাতার রাজ্যের মালিক হবে। তুমি আর শাহজমান এখনই ফরমান আর রাজীনামায় পাঞ্জার ছাপ লাগাও। দেরি ক'রো না, তা হলে বিপদে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে শাহরিয়ার আর শাহজমান দলিলে পাঞ্জার ছাপ দিলেন। তার পর শাহরিয়ার করজোড়ে বললেন, শাহজাদী, দয়া কর। এখানে তোমাদের সখীদের দেখলে আমরা প্রলোভনে পড়ব, প্রাণ হারাব। আমাদের অন্য কোথাও থাকতে দাও।

—তা থাকতে পার। এই গুলবুলিস্তানের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে, সেখানে তোমরা সুখে থাকতে পারবে। সাত দিন অন্তর এখান থেকে রসদ পাবে। দুজন মোল্লাও মাঝে মাঝে গিয়ে ধর্মোপদেশ দেবেন। ওখানে তোমরা পাপমোচনের জন্যে নিরন্তর তসবি জপ করবে এবং হরদম আল্লার নাম নেবে।

পাঁচ বৎসর পরে মোল্লারা জানালেন যে আল্লার কৃপায় দুই ভ্রাতার চরিত্র কিঞ্চিৎ দুরস্ত হয়েছে। তখন দুই শাহজাদী নিজ নিজ স্বামীকে মুক্তি দিলেন, তালাকও দিলেন।

শাহরিয়ার ও শাহজমান দেশে ফিরে গিয়ে দেখলেন, প্রজা সৈন্য আর রাজকোষ সব বেহাত হয়ে গেছে, শমসের আর নওশের সিংহাসনে জেঁকে বসেছেন, রাজ্য ফিরে পাবার কোনও আশা নেই। অগত্যা তাঁরা বাগদাদে গেলেন এবং কাফিখানার জনতাকে আরব্য রজনীর বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে কোনও রকমে জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন।

১৮৮১